যুব সংসদ ২০১৭ অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী
ও অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ

Bhangar Mahavidyalaya
STUDENTS' UNION

নবীন বরণে অধ্যক্ষ বরণ

ছাত্র সংসদের প্রাক্তন ও বর্তমান প্রতিনিধিরা

ছাত্র সংসদের বর্তমান প্রতিনিধি বৃন্দ

শিক্ষামূলক ভ্রমণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের
ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ

কলেজের এন.সি.সি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী

জাতীয় সেবা প্রকল্পের ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ

রক্তদান উৎসবে এন.সি.সি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

বার্ষিক পত্রিকা

দশম বর্ষ

সৃষ্টি

নবীন বরণ উৎসবের শুভ উদ্বোধন পর্বে
আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, কাইজার আহমেদ প্রমুখ

নবীন বরণ উৎসবে আব্দুর রেজ্জাক মোল্লাকে
স্মারক প্রদান

নবীন বরণে নেত্রী জয়া দত্ত সহ অন্য স্থানীয় নেতৃত্ব

বৃক্ষরোপণ উৎসব

বিশেষ বর্ক্তৃতা ঃ বক্তা ন্যান্সী রাইট

জাতীয় সেবা প্রকল্প ঃ সপ্তাহব্যাপী কর্মশালা

নবীন বরণ উৎসবে পরিচালন সমিতির সদস্য
কাইজার আহমেদ সাহেবকে বরণ করা হচ্ছে

নবীন বরণে আগত বিশিষ্ট অতিথি
ডঃ সুবীরেশ ভট্টাচার্যকে বরণ করা হচ্ছে

সৃষ্টি

SRISTI

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

বর্ষ - দশম

Bhangar Mahavidyalaya
Annual College Magazine

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়
ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

সৃষ্টি

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

বর্ষ - দশম

SRISTI

Bhangar Mahavidyalaya Annual College Magazine

প্রকাশ ঃ ২০১৮

সভাপতি ঃ ড. বীরবিক্রম রায়
অধ্যক্ষ, ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

সম্পাদক মন্ডলী ঃ যুগ্ম সম্পাদক ঃ ড. সংযুক্তা চক্রবর্ত্তী ও
সাহীদ হাসান
সদস্য মণ্ডলী ঃ ড. নিরুপম আচার্য, ড. মধুমিতা মজুমদার,
ড. পূর্বাশা ব্যানার্জী, শর্মিষ্ঠা সাধু, ড. রজত দত্ত,
জগবন্ধু সরকার, সোমা রায়,লালমিয়া মোল্লা,
জাহাঙ্গীর সিরাজ, মোসা করিম,
মহঃ ওয়াসিম (ছাত্র প্রতিনিধি)

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ ড. সংযুক্তা চক্রবর্ত্তী, ড. পূর্বাশা ব্যানার্জী

প্রকাশক ঃ ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়
ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

মুদ্রক ঃ রাজ প্রিন্টিং এন্ড ডি.টি.পি সেন্টার
ভাঙ্গড়, দঃ ২৪ পরগণা। ৯৭৩২৬৬২০৫৪

সূচি ঃ

পৃষ্ঠা নং
সম্পাদকীয়- ৪
অধ্যক্ষের প্রতিবেদন - -ড. বীরবিক্রম রায় ৫
হেড ক্লার্কের ডেস্ক থেকে - মহঃ কুদ্দুস আলি ৬
সাংস্কৃতিক সম্পাদক - প্রতিবেদন ৭
ক্রীড়া সম্পাদক - প্রতিবেদন ৭

প্রবন্ধ ঃ-

Vivekananda's Nation of Dharma - Prof. Nanda Ghosh ৮ - ৯
Relevance of Vivekananda's Values in the World - Prof. Purnendu Sekhar Roy ১০ - ১১
How to Speak Correct English - Prof. Tathagata Das ১২ - ১৩
A Short History of Nalanda Mahabihara - Prof. Soma Roy ১৪ - ১৫
ডোকালাম - অধ্যাপক জয়গোপাল মন্ডল ১৬
তথ্য ও যোগাযোগের প্রযুক্তি ধারণা - অধ্যাপক দেবদাস মন্ডল ১৭ - ১৯
বিষয়ঃ কবীর ঃ এক সমন্বয়ী চরিত্র - দিবাকর মন্ডল, সহ অধ্যাপক (ইতিহাস বিভাগ) ২০ - ২১
যানলিপি ঃ নানাদিক - সহ অধ্যাপক মলয় বারিক ২২ - ২৪
কলেজ গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ও ছাত্রদের গ্রন্থাগার বিমুখতার কারণ অনুসন্ধান - সাহীদ হাসান (গ্রন্থাগারিক), মোসা করিম (গ্রন্থাগার কর্মী) ২৫ - ২৭
নারী ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা - মধুমিতা নস্কর, বাংলা (অনার্স) প্রথম বর্ষ ২৮ - ২৯
অধীনতা - সুমন পাল, বাংলা (অনার্স) প্রথম বর্ষ ৩০
একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ ও আমরা - রাজীব আলম, বাংলা (অনার্স) প্রথম বর্ষ ৩১

গল্প ঃ .

সন্দীপের স্বপ্ন - অধ্যক্ষ, ড. বীর বিক্রম রায় ৩২ - ৩৫
আত্মহত্যা না হত্যা - অধ্যাপক অপরূপ চক্রবর্ত্তী ৩৬ - ৪০
কবিতা ঃ ৪১ - ৫০
মহিবার রহমান, ইব্রাহিম মোল্যা, মোঃ মোয়াল্লেম মোল্যা, আসরাফুল খান, মাবিয়া পারভিন, আসমা খাতুন, মিকাইল মোল্যা, অনামিকা মন্ডল, সাবির হোসেন, মোঃ বিপুল রহমান।
চিত্র ঃ- সকাল চৌধুরী (বাংলা অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষ) ৫১
ঝুমা মাহালী - (বাংলা অনার্স, প্রথম বর্ষ) ৫২

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে দশটি বছর পার হয়ে গেল। তবুও প্রতিটি নতুন সৃষ্টির আনন্দই অবর্ননীয়। নতুন রূপে, নতুন ভাবনায় তা চির নতুন। ছাত্র - শিক্ষকের মিলিত প্রচেষ্টায় রচিত এই নতুন সৃষ্টি পাঠকের অন্তরের এক কোণে স্থান পেলে আমাদের ভালো লাগবে।

একটি দশক পার করলেও 'সৃষ্টি'কে হয়তো সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যর্থতা আমরা মাথা পেতে নিলাম।

তাই আপনাদের মূল্যবান মতামতের ও সমালোচনার অপেক্ষায় থাকলাম। যার দ্বারা পরবর্তী সংখ্যায় কিছুটা হলেও যদি ত্রুটির পরিমান কমাতে পারি।

শুভেচ্ছাবার্তা

একটু দেরীতে হ'লেও ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় - ছাত্রসংসদ তাদের বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করায় তাদের ধন্যবাদ জানাই। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই। অভাব আছে সেগুলির সুসংহত প্রকাশের আয়োজনে। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা সাহিত্য শিল্প সৃষ্টিতে আগ্রহী, এই পত্রিকার মাধ্যমে তাদের আত্মপ্রকাশের আয়োজন সম্পূর্ণ হল।

নিরন্তর তাগাদা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের থেকে তাদের সেরাটি আদায় করে দু'মলাটের মধ্যে নিয়ে আসার যে প্রচেষ্ঠা ম্যাগাজিন কমিটি করেছেন তার জন্য কোনও সাধুবাদই যথেষ্ট নয়। কলেজের অধ্যাপক - অধ্যাপিকারা তাদের লেখা ম্যাগাজিনে দিয়ে এটিকে আরোও সমৃদ্ধ করবেন এই আশা রাখি।

ধন্যবাদান্তে -

ডঃ বীরবিক্রম রায়

অধ্যক্ষ

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

।। হেড ক্লার্কের ডেস্ক থেকে।।

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা 'সৃষ্টি' প্রকাশের পথে। শুভেচ্ছা রইল। ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্ল্যাটফর্ম কে ব্যবহার করুক। নতুন নতুন সৃষ্টি কর্মে মেতে উঠুক এই আশা রাখি।

মোঃ কুদ্দুস আলি
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে

২০১৮ সালে বার্ষিক পত্রিকা সৃষ্টি প্রকাশের পথে।
এই সাধু উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।
এই প্রকাশের মুহূর্তে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

অমিত কুমার মন্ডল
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
ছাত্রসংসদ

ক্রীড়া সম্পাদকের কলমে

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকা 'সৃষ্টি' প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম আশা করি 'সৃষ্টি' পত্রিকা আমাদের কলেজের সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিয়ে আসবে নব সৃষ্টির বার্তা। এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক দেশের কোণে কোণে, সৃষ্টি হোক আরো নতুন সাহিত্য প্রতিভার। এই পত্রিকার সার্বাঙ্গীন কুশল ও বিকাশ কামনা করি।

—মহঃ নাজমুল হোসেন

Vivekanand's Notion of Dharma

Nanda Ghosh
Associate Professor
Dept. of Philosohy

The notion of 'Purusarthas' plays very important role in Indian Philosophy where we find four purusarthas - 'Dharma'. 'Artha', 'Kama and Moksa'. The order is very important to maintain as because Dharma is the Supreme, meaning Sadachara, which is embracing all other three. None of the three will be regarded as 'value' if they are not acquired by Sadachara, Dharma.

To explain : artha or money, we all know, a means to fulfill our desires, important to carry out our living, will be a 'value' if and only if it is acquired not by any wrong way but by Sadachara (good action) Same is true for Kama (fulfilment of desires) and even in attaining Moksa. (it has to be by proper means). Indian Philosophy is very strict in its attainment of Purusarthas.

The notion of 'Dharma' has been used in different senses throughout culture not civilisation. We need not enter into that detail, instead, we want to harp on to Vivekananda's use of the term in question Vivekananda's notion of Dharma fosters human wellbeing - he does not endorse an anemic kind of dharma that consists in passively abiding by the stereotyped codes of conduct spoken of in the traditional caste system. It is not indoctrination, it must not remain apathetic to social agoneis and hence it should be what would constitute the paths to the expunction of the prevailing social wrong doings, yielding thereby the betterment of people as a whole. It has to express and confirm itself in the service of humanity Vivekananda puts this ponit thus : 'You may invent an image through which to worship God, but better image already exists, the living man. You may build a temple in which to worship God, and that may be good, but a better one, a much higher one, already, exists, human body.'

Vivekananda, says 'one looks for name and fame and covers his efforts to obtain them with the enamel of charity and good works. He is working for himself under the pretext of working for others. Every so called charity is an encouragement of the very evil it claims to operate against'.

As Vevekanda sees to help others really amounts to rendering help or service to oneself. For, in and through doing good to the world, one invariably undergoes oneself 'moral excellence' - doing good to others, thus, gives one the opportunity to better oneself. all 'good acts tend to make us pure and perfect.

Undoubtedly, the realisation of this would, in all possibilities, prompt one to help and serve others more readily than one would otherwise be inclined to.

Not depending on just the 'help', the service that one would render either by the 'realisation' we talked to or by 'spontaneity' / 'spontaneous thrust' of oneself. Vivekananda also speaks of proper education is essential for the betterment of the downtrodden so that they come to realise that they too have a right to welfare and thus come to develop the required determination to fight for themeselves.

Thus V says, '...the only service to be done for our lower classes is to give them education, to develop their lost individuality'. To do this we are to inculcate the sense of fellow-feeling - that there is no essential difference between men - a sense of brotherhood. This would help the downtrodden to come out of their sense of inferiority and indignity thus, eventually, they will be 'human beings' in the true sense by the attainment of self confidence, self-reliance.

Thus in Vivekananda's opinion dharma requires us to render service to the poor in concrete and specific terms and to make them realise that they deserve this service. Dharma or duty must aim at eliminating real miseries of individuals. Dharma must also aim at enhancing the conditions of humans in general and of poor class in particular.

In the words of Vivekanada, 'who cares whether there is a heaven or a hell, who cares if there is a soul or not, who cares if there is an unchangeable or not? Here is the world, and it is full of miseries. Go out into it....., and struggle to lessen it or die in the attempt ..... this is the first step, the first lesson to be learnt, whether you are a theist or an atheist, whether you are an agnostic or Vedantist,a christian or a Mohammedan'.

It may be concluded by saying that Dharma is a practical pursuit in that it is to be substantiated in terms of the sincere endeavour to render service in concrete terms to actual individuals. It is no doubt Sadachara (honest gesture, satachara) as we have seen it is used in classical Indian Philosophy. After all, it is the first and most important pillar Purusartha so to say. Moreover it will give rise to a welfare state if we can go on pursuing this notion of Dharma as V speaks of. No doubt it will give us a healthy society in particular and a Heavenly Universe in general. Nothing more can be the need of the hour at this crucial juncture of our LIFE !!

Relevance of Vivekananda's values in the World

Purnendu Sekhar Ray
Assistant Professor
Department of History

Changes happening very fast in today's world. So there is danger of losing focus .Mostly people in present times are selfishly busy in accumulating material comforts. This race for amassing wealth has led to economic disparity. Immoralities are becoming part of character. Degradation of values is seen in acts like murder, rape, corruption, theft, cheating. Food adulteration & suicide. Character building, moral strength is essence of his teaching. Therefore they have become more relevant.

How relevant is Swami vivekananda's message of religious harmony on his 150th birth anniversary that was celebrated on 12 January 2018. This is a matter of speculation in the context of the implementation of humanitarian values that he stood for. In the perspective of the present troubled scenario, is unlikely to have an impact on the powers that be in the context of public awareness.

Saffron clad man gave simple teachings instead of emphasis on difficult facts of Vedanta. He took interest in good ideas of western world, music. In both trance, music he got lost. Sensitive person starts taking interest in fine arts like painting, music, poetry. Character- r building, moral strength is essence of his teaching. Knowing about other states of India makes us feel amazed proud about India. Swamiji was offered teachers job in Vidhyasagar's school with much difficulty, but he refused as wanted to serve ailing Master suffering with cancer. Ramkrishna wanted to give him all siddhi , but Swamiji refused as it cannot show him God. Swamiji after master's death became wandering monk. In kanyakumari after 3 days Swamiji got his goal in life.

In course of expounding the religious convictions of Hinduism, Buddhism, Christianity, Sikhism and also prophed Muhammed who advocates the worship of one God in Islam who is eternal, incomparable and absolute. Today, I feel somewhat sceptical as to whether following the unity of a humanitarian path of religious harmony as advocated by Swami Vivekananda is feasible.

Thus, through his universal religion, Vivekananda preached the unity of god. He told that though the paths are different for different religions but the goal is same. He attached great importance to the unity of all religions and their fusion into one universal religion.

Vivekananda considered Hinduism to be the mother of all religions. He established through historical sequence. He showed that Vedic religion had influenced Buddhism which again was instrumental in influencing Christianity. He told that all the religions of the world have the same value and importance. In the Parliament of Religions he told—

"The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to his own law of growth ….Upon the banner of every religion soon be written … 'Help and not fight', Assimilation and not Destruction Harmony, and peace and not Dissension.

How to Speak Correct English

Tathagata Das
Asst. Professor in English

In his essay titled 'Spoken English and Broken English', George Bernard Shaw addresses his foreign readers and provides some advice regarding the correct way to speak the English language. The essay is divided into three parts. In the beginning of the essay, Shaw says that when a foreigner travels in the British Commonwealth he should always remember that there is no such thing as correct English since no two British subjects speak the same English.

Shaw next goes on to give some examples in support of his statement. He tells his readers that he is a member of a Committee that has been established by the British Broadcasting Corporation in order to determine the ways and means of correct pronunciation. But, surprisingly enough, Shaw says, no Committee member agrees as to the pronunciation of some of the commonest words in the English Language, such as 'yes' and 'no'. Also, no member of the Committee pronounce these words exactly alike. However, each of them is understood by the listeners when they speak. Thus, one is faced with the problem of which speaker to follow. This problem arises since there are people of different nationalities in the committee-Irish members, Scottish members, Welsh members, Oxford University members, American members etc. Each one of these speakers can be recognized by the distinctive ways in which they speak. Their speech is conditioned by the mode of speech and pronunciation followed in the respective countries where they were born. Shaw says that it is natural that since all of them speak differently, it would not be correct at all to say that they all speak correctly. It is to be noted that all of them speak presentably, that is, in a way which can be understood by the ordinary people. So, if anyone tries to follow any one of them, he would be understood perfectly in any English speaking country.

In the second part of his essay, Shaw concentrates on "company manners" and "home manners." He says that everyone has his own way of speaking in one way when he is at home and in another way when he is among outsiders. Thus, there is a marked change in the way one speaks in private and in public. While addressing a stranger, one tends to pronounce each word distinctly so that he understands but at home one is not so observant in one's speech and so while speaking the syllables often tend to get jumbled up. Shaw here gives humorous example in the question "What o'clock is it?' which when put to a stranger sounds perfect but when put to a family member becomes jumbled up like 'cloxst'. Therefore, Shaw says, it is really surprising to note how different one sounds at home and in public.

In the third and last part of the essay, Shaw addresses his foreign hearers and gives them advice as to the manner in which they should speak English. He emphasizes once again that there is no such thing as "Perfectly correct English' but there is only 'presentable English' which may be termed 'Good English'. This is because most Londoners speak English very badly. A foreigner, if he speaks good English, becomes unintelligible to them. This happens because it is impossible for a foreigner to imitate exactly the speech of an Englishman and stress the syllables and make his voice rise and fall in question and answer, assertion and denial, in refusal and consent. But, if he avoids the elaborate grammatical phrases and speaks English without grammar, he will be immediately understood and many people would rush to help him. So, Shaw advocates the use of a strong foreign accent while speaking and to speak broken English and it is really surprising to know how little one needs to know and how badly one may pronounce while travelling in a foreign country.

Lastly, Shaw warns thet when one is conversing with educated people, a foreigner should not try to speak too well. The English people would really feel insulted if they cannot understand their own language when spoken by a foreigner. Thus, Shaw gives the advice to stay away from "pedantic affectation" or an attempt to be too scrupulous with a view to impress others. Thus, this essay is a valuable guide for foreign speakers of the English language on the ways and means of speaking in public.

A SHORT HISTORY OF NALANDA MAHAVIHARA

Prof. SOMA ROY ,
DEPARTMENT OF HISTORY

Nalanda was an acclaimed Mahavihara ,a large Buddhist monastery in ancient india.The site is located about 95 kilometres southeast of Patna. It was a centre of learning from fifth century CE to c. 1200 CE. This Mahavihara flourished under the patronage of the Gupta Empire in 5th and 6th centuries and later under Harsha, the emperor of Kannauj.Nalanda was initially a prosperous village by a major trade route that ran through the nearby city of Rajagriha which was than the capital of Magadha.Taranatha ,the 17 th century Tibetan Lama , states that the 3rd century BCE Mauryan emperor,Ashoka ,built a great temple at Nalanda and 3rd century CE the Mahayana philosopher ,Nagarjuna ,and his disciples,Aryadeva, at Nalanda with the former also headlinded the institution.While this could that there was a flourishing centre for Buddhism at Nalanda before the 3rd century,no archaeological evidence has been unearthed to support the assertion. The founder of this Mahavihara was Shakraditya and he is identified with the 5th -century CE Gupta emperor ,Kumaragupta I .His successors Buddhaupta ,Tathagatagupta,Baladitya, and vajra,later extended the institution by building additional monasteries and temples.The post-Gupta period saw a long succession of kings who continued building at Nalanda .After the decline of Guptas, the most notable patron of the Mahavihara was Harsha,the 7th-century emperor of kannauj.He was a converted and considered himself a servent of the monks of Nalanda.He built a monastery of brass within the the Mahavihara and remitted to it the revenues of 100 villages.The subjects taught at Nalanda covered every field of learning and, it attracted pupils and scholars from Korea,Japan,China,Tibet, Indonesia,Persia and Turkey.All the students of Nalanda studied the Mahayana and Hinayana sects of Buddhism.In addition of these ,they studied other subjects such as the Vedas,logic ,grammar and philosophy.medicine the atharvaveda, and samkhya.Other subjects believed to have been taught Nalanda include Law,Astronomy, and city- planning.With upwards of 30,000 monks and nuns including 2,000 teachers living ,studying and practicing there during its heyday, Nalanda was unmatched. Traditional Tibetan sources mention the existence of a great library at Nalanda named Dharmaganja which comprised of three large multi- storeyed buildings ,the Ratnasagara,the Ratnodadhi ,and the Ratnaranjaka.The library not only collected religious manuscrippts but also had texts on such subjects as grammar,logic ,literature,astrology ,astronomy and medicine.Nalanda was one of the world's first residential universities.The Mahavihara, built in red bricks , was considered to be an architectural masterpiece.It had eight separate compounds and ten temples, along with many other meditation halls and classrooms.Many of famous Buddhist scholars had studied and taught at Nalanda including Nagarjuna,Dharmapala Dharmakirti, Dinnaga, Jinamitra ,Santaraksita,Padmasambhava,Chandrakirti,Silabhadra and Atisa.

The decline of Nalanda is concomitant with the disappearance of Buddhism in India.Buddhism had steadily lost popularity with the laity and thrived, thanks to royal patronage ,only in the monasteries of Bihar and Bengal .The rise of Hindu philosophies in the subcontinent and the waning of the Buddhist Pala dynasty after the 11 century meant that Buddhism was hemmed in on multiple fronts, political , philosophical, and moral.Nalanda was ransacked and destroyed by an army of Mamuluk Dynasty of Delhi Sultanate under Bakhtiyar Khilji in c.1200CE.

Reference Books:
1.Altekar, Anant Sadashiv(1965),Education in Ancient India,Nand Kishore.ISBN8182054923.
2.Dutt,Sukumar(1962).Buddhist Monks And Monasteries of India.
London: George AllenUnwin Ltd(Reprinted 1988).ISBN 81-208-0498-8.
3.Ghose,Amalananda(1965).A Guide to Nalanda (5ed.).New Delhi.
4. Sharma,Shuresh Kant (2005).Encyclopaedia of Higher Education:Historical Survey- pre-independence period.Mittal Publications.ISBN 8183240178.
5. Sastri, Hiranand(1986)Nalanda and its Epigraphic Material.New Delhi:Sri Satguru Publications.

ডোকালাম

জয়গোপাল মন্ডল
Asst. Professor
Dept. of Political Science

সাম্প্রতিক ভারতীয় রাজনীতিতে একটি বহুচর্চিত বিষয় হল ডোকালাম (Dokalam)। বিগত বছরের জুন মাসে ভারত ও চীনের মধ্যে এই এলাকাটির দখল নিয়ে যথেষ্টই সামরিক উত্তেজনা ছড়ায়। উক্ত এলাকাটি ভারত-চীন এবং ভূটানের মধ্যে রাজনৈতিক তথা ভূখন্ডগত সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হয়। যদিও এলাকাটি সরাসরি ভারতের এলাকা ভুক্ত নয়। শুধুমাত্র ভুটানের সাথে বৈদেশিক চুক্তির কারণে ভুটানের বিদেশনীতি ভারত নিয়ন্ত্রণ করে। ২০১৭ সালে এলাকাটির দখল নিয়ে ভারত ও চীনের সেনারা টানা ৭৩ দিন সামনা-সামনি অবস্থান করে এবং পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে পড়ে যে, যে-কোন সময়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। কিন্তু উভয় দেশের সদিচ্ছা এবং কূটনৈতিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধের পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে একথা মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে চীন এবং ভুটানের সীমান্ত নিয়ে ভারত কেন এত বেশি চিন্তিত এবং আরো একটি জটিল সমস্যা হল ভুটান সরাসরি ভারতকে সমর্থন ও করছে না। প্রশ্নটির সহজ সরল উত্তর হল ভারতের কাছে ডোকালাম শুধুমাত্র সীমান্ত সমস্যা নয় - এটি হল জটিল কৌশলগত অবস্থানের প্রশ্ন তথা চীনের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করার অঙ্গিকার। চীনের দীর্ঘমেয়াদি বিদেশনীতির একটি অন্যতম কৌশল হল ভারতকে বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশকে নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে ঘিরে ফেলা। এক্ষেত্রে ডোকালাম জয় করলে ভারতের বিরুদ্ধে কৌশলগত অবস্থান সুদৃঢ় হবে।

ডোকালাম প্রসঙ্গে পরিশেষে বলা যায় যে সমস্যাটি কিন্তু মিটে যায়নি এর সঠিক সমাধানের রাস্তা এখনও বার করা সম্ভব হয়নি। চীন বর্তমানে ভুটানের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এমত অবস্থায় ভারতকে আরো বেশি করে ইস্যুটিকে নিয়ে ভাবতে হবে এবং নিজদের স্বার্থ বজায় রেখে সমাধানের প্রচেষ্টা করতে হবে। আশা করা যায় নিকট ভবিষ্যতে ভারত ডোকালাম বিতর্কটির সুষ্ঠ সমাধান করবে এবং চীনের সাথে সীমান্তের সামরিক উত্তেজনা নিরসনে সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

তথ্য ও যোগাযোগের প্রযুক্তি ধারণা

(Concepts of Information and Communication Technology)

Debdas Mondal
Asst. Professor
Dept. of Education

একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্বায়নের পথে যুগের তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র বিদ্যমান। সারাদেশে প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করেছে। একথা অনস্বীকার্য যে প্রযুক্তি ছাড়া গোটা পৃথিবী আজ অচল। গবেষণা থেকে শুরু করে, ব্যবসা, শিক্ষা, কৃষি চিকিৎসাসহ ঘরে বাহিরে, মহাকাশে, মহাসমুদ্রে সকলক্ষেত্রেই আজ প্রযুক্তির ছোঁয়া। প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া আজকের পৃথিবীতে কোন কিছুই কল্পনা করা যায় না। ব্যবসা শিক্ষা-কৃষি, উন্নয়নমূলক সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড সহ সকল কর্মক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়াও দেশের জনগোষ্ঠীকে সরকার তথ্য ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্বের জ্ঞান ও তথ্য ভান্ডারের প্রবেশের অসীম সম্ভবনার দরজা খুলে দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে যোগাযোগ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, মেধাচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশ, বিনোদন ইত্যাদি সকলক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এটি কর্ম সম্পাদনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

আধুনিক সভ্যতার উন্নয়ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল বর্তমানে ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে টেলি যোগাযোগ, কম্পিউটিং, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ও বিনোদন শিল্প সহ প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখাকে পৃথক ভাবে কল্পনা করা যায় না। এসব প্রযুক্তি মিলে মিশে সৃষ্টি হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ এখন তথ্য নির্ভর সমাজের দিকে ধাবিত হয়েছে। এই তথ্য সমাজে অবস্থান করার জন্য তিনটি প্রধান কাজ হল -

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা ICT এর অবকাঠামো ও তাতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিন্ত করে বর্তমান সমাজকে তথ্য সমাজের দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা।

২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা ICT দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা। যাতে তথ্য সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়।

৩. সর্বক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা ICT এর ব্যবহার নিশ্চিত করা। সভ্যতার ক্রম বিকাশের ফলে বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কাজ করেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ধারণাটি দুটি ভিন্ন ধারণার সমন্বয়ে তৈরী হয়েছে। একটি হল তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology) ও অন্যটি হল যোগাযোগ প্রযুক্তি (Communication Technology)।

তথ্য প্রযুক্তি ঃ- (Information Technology)

তথ্য প্রযুক্তি শব্দটি 'তথ্য' ও 'প্রযুক্তি' - এই দুটি শব্দের সমাহার। 'তথ্য' শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা হল 'Information'। ইংরেজি 'Information' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Informatio' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এই শব্দটির ক্রিয়ামূল Informari যার অর্থ হল কাউকে কোন কিছু অবগত করা পথ দেখানো, শেখানো, আদানপ্রদান ইত্যাদি অর্থাৎ সংগৃহীত ডেটা বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পর প্রয়োজন মত সাজানো বা অর্থপূর্ণ অবস্থা কে তথ্য বা Information বলা হয়। অন্য ভাবে বললে বলা যায় যে, বিভিন্ন ডেটাকে প্রক্রিয়াজাত করণ, পরিচালন এবং সংঘবদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল কে তথ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা কোন মানুষের মস্তিষ্কে প্রেরণ করা হলে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। একটি ধারণা হিসাবে নিলে তথ্য শব্দটির প্রচুর অর্থ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এবং প্রযুক্তির খাতে দৃষ্ট হয়। আর 'প্রযুক্ত' শব্দটির ব্যবহার বহু মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক জীবন যাত্রায় ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে জীবন যাত্রা পূর্বের তুলনায় আরও সহজ হয়ে ওঠে অর্থাৎ প্রযুক্তি হল কিছু প্রায়োগিক কৌশল যা মানুষ তার উন্নয়ন কার্যে ব্যবহার করে থাকে। অন্য ভাবে বলা যায় যে, যে কোন যন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তা দক্ষ ভাবে ব্যবহারের ক্ষমতাকেও প্রযুক্তি বলা হয়। বিভিন্ন কাজে মানুষের সক্রিয় অংশ গ্রহণ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষের কাছে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত তথ্য পাওয়ার গুরুত্ব অনেকাংশেই বেড়ে গেছে। কারণ মানুষের নিজের পক্ষে সব ধরনের তথ্য কে মনে রাখা বা হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব হয় না। এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রযুক্তি যার মাধ্যমে মানুষ তার চাহিদা মাত্রই সহজে ও দ্রুততম সময়ে তথ্য পেতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ, এর সত্যতা ও বৈধতা যাচাই সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিকীকরণ, পরিবহন, বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে তথ্য প্রযুক্তি বা Information Technology বলা হয়। এক কথায় তথ্য ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি কে তথ্য প্রযুক্তি বলা হয়।

অন্যভাবে বলা যায় যে, কম্পিউটার এবং টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, একত্রীকরণ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিনিময় বা পরিবেশনের ব্যবস্থা কে তথ্য প্রযুক্তি বলে। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অথবা দক্ষ ব্যবস্থ্পনার তথ্য আহরণ, সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ ও তথ্য বিতরণের গুরুত্ব অনেক। আর এই তথ্য আহরণ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ , তথ্য বিতরণ ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক কার্যাবলী পরিচালনার বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়াকেই এককথায় তথ্য প্রযুক্তি বলা হয়।

যোগাযোগ প্রযুক্তি (Communication Technology)

তথ্য প্রযুক্তি শব্দটির মতই যোগাযোগ প্রযুক্তি শব্দটিও 'যোগাযোগ' ও 'প্রযুক্তি' এই দুটি শব্দের সমাহার। যোগাযোগ হল তথ্য আদান প্রদানের উপায়। একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমের দ্বারা মানুষ থেকে মানুষ বা যন্ত্র থেকে যন্ত্রে তথ্য আদান প্রদান হতে পারে।

ইংরাজী Communication শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Communis' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যোগাযোগের অর্থ হল প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে অভিন্ন সংকেতের বিনিময়।

Newman Summer এর মতে " Communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more person's." (যোগাযোগ হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির তথ্য, ধারণা, মতামত বা আবেগের বিনিময়)।

ডেটা কমিউনিকেশান ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে যোগাযোগ প্রযুক্তি বা Communication Technology বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার ডিজাইন নির্মান ও পরিচালনা করা সম্পর্কিত কার্যকলাপ কে যোগাযোগ প্রযুক্তি বা Communication Technology বলা হয়।

সাধারণ ভাবে বলা যায় যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা ICT হল তথ্য প্রযুক্তি বা Communication Technology এর সঙ্গে অন্যান্য প্রযুক্তি প্রধানত যোগযোগ প্রযুক্তি বা Communication Technology এর সমন্বয় সাধন। যে কোন প্রকারের তথ্যের উৎপত্তি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ সঞ্চলন এবং বিচ্ছুরণে ব্যবহৃত সকল ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা Information and Communication Technology বলা হয়।

বিষয় ঃ কবীর ঃ এক সমন্বয়ী চরিত্র

দিবাকর মন্ডল
সহ অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ।

ভারতীয় জীবনধারার সাথে ধর্মের সংযোগ অবিচ্ছেদ্য। সময়ের অগ্রগতির সাথে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার রূপান্তর যেভাবে ঘটেছে, তার মূলে অনেকটাই আছে ধর্মভাবনার পরিবর্তন। ধর্মভাবনার বিবর্তনে ভারতীয় ইতিহাসে মধ্যযুগ উল্লেখযোগ্য। সমন্বয়বাদী উদার একদল ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন এই নাটকীয় ধর্মীয় বিবর্তনের জনক। যাঁদের মধ্যে বারাণসীর তাঁতী কবির ছিলেন সবথেকে জনপ্রিয়। যিনি ধর্মীয় সমন্বয়ের পাশাপাশি সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবী করেন।

মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদী সাধক কবীরের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে পন্ডিত মহলে বির্তক আছে। অনেকের মতে, ১৪৪০ সালে (মতান্তরে ১৩৯৮ সাল) বারাণসীর এক ব্রাহ্মন বিধকর সন্তানরূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আবুল ফজল ''দবিস্তান-ই-মজহিব গ্রন্থানুসারে'' কবীর জোলার বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আবার অনেকের মতে, ''তিনি সত্য নিরঞ্জন পুরুষ তাঁহার আবার জন্ম কী'' ? কবীরের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে রহস্য থাকলেও একথা ঠিক যে, বাল্যকাল থেকেই ভক্তিবাদী বিখ্যাত সাধক রামানন্দের দর্শন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। কবীরের ধর্মভাবনায় হিন্দু, মুসলিম দুধরনের দার্শনিক প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও একথা ঠিক যে, কবীর তাঁর জীবদ্দশায় দুই ধর্মকেই সমালোচনা করেন। হিন্দু-মুসলিম কোন সমাজেরই অর্থহীন বাহ্য আচারকে তিনি গ্রহণ করেননি। মিথ্যা আচারকে আঘাত করার অসাধারণ শক্তি তাঁর ছিল। কবির ছিলেন শাস্ত্র জ্ঞানহীন নিরক্ষর ব্যক্তি, কাজেই শাস্ত্র শাসিত ধর্মসম্প্রদায় গুলির মতো কোন বাঁধা পথ তাঁকে আবদ্ধ করেনি। তিনি ছিলেন নতুন দৃষ্টি, নতুন পথ, নতুন ভাবনার কান্ডারী ; যে পথে মানব মনের ভালো-মন্দ নানাভাবে পরখ করার বিস্তর স্বাধীনতা তিনি আপনা থেকেই অর্জন করেছিলেন। তাঁর স্বাধীন চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'দোঁহা' নামে প্রসিদ্ধ তাঁর ছোট ছোট দু-লাইনের হিন্দি কবিতার মাধ্যমে। তাঁর বানী গুলি ভারতীয় ঘরানার ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের অভিজ্ঞান।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বানী প্রচার ও সৌহার্দ্য স্থাপনের আন্তরিক প্রয়াসে কবীরের বানী ও দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় ভক্তি সাধক কবীরের একশোর উপর কবিতা ইংরাজী অনুবাদ হয়, যা ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী ব্যক্তি ও আধ্যাত্মিক নেতা 'জাতির জনক' মোহনদাস করমচন্দ গান্ধীর মাতা পুতলীবাঈ কবীরের দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন। কবীরের মতো গান্ধীজীও নিম্নশ্রেণীর মানুষদের নিয়েই আন্দোলনে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। অক্ষর জ্ঞানহীন শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরও কবীরের মতোই একই পরিধি ও পরিস্থিতিতে ধমীর্য় বানী প্রচার করেন।

কবীর অতি সাধারণের কথ্য হিন্দি ভাষায় তাঁর বানী প্রচার করেন। তিনি অভিজাত সংস্কৃত ভাষার ধার ধারেননি। এসম্পর্কে তিনি বলেন, - ''সংস্কৃত কূপ জল ; কবীরা ভাষা বহতা নীর'' (অর্থাৎ- ''সংস্কৃত হল কূপ জল ; আর ভাষা হল প্রবাহমান ধারা'') - কবীর সরল হৃদয়ের কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাই তাঁর বানী অপার শক্তি। কবীরের শ্রোতা ছিলেন সাধারণ মানুষ, কারিগর, চাষী, গ্রামের মোড়ল। তাঁর ব্যবহৃত উপমা ও রূপক গুলি এই সমস্ত মানুষের জীবনের দুঃখ কষ্ট থেকেই নির্গত। তাঁর ভাষা ছিল এদেরই মুখের বুলি।

কবীর এক নির্বিকল্প একেশ্বরবাদের প্রবক্তা ছিলেন। যেখানে মূর্তিপূজা ও আচার-অনুষ্ঠানের কোন স্থান ছিল না। তিনি বলেন যে, - ''আল্লা, রাম, রহিম, করিম, কেশব, হরি, হাজরা সবাই এক ভগবানের আলাদা নাম''। কবীর বিভিন্ন ধর্মের স্বতন্ত্র ও বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে বলতেন, - ''ঈশ্বর মসজিদে নেই, মন্দিরে নেই; কাবাতে ও নেই, কৈলাসে ও নেই, আচারে ও নেই, যোগে ও নেই, ত্যাগে ও নেই - ঈশ্বর আছে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে''। তিনি আরো বলতেন - ''সত্যই হল একমাত্র সহজ''। সেই সত্যকে বাইরে খুঁজে বেড়াবার দরকার নেই। তীর্থে, ব্রতে, আচারে, তিলকে, মালায়, ভেকে, ও সাম্প্রদায়িকতায় সত্য নেই - সত্য আছে অন্তরে ; তার পরিচয় মেলে প্রেমে ভক্তিতে ও দয়ায়।'' কবীরের সহজ সরল দোঁহা গুলি ছিল বেশ অর্থপূর্ণ। তিনি বলেন -

> "I laugh, when I hear, that, the Fish in the water is thirsty ;
> I laugh, when I hear that people go on pilgrimage to find God.

অনুবাদক ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধ্যযুগীয় ভারতে কবীরই হলেন একমাত্র সাধক যাঁর বানীর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে শিখ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব'-এ স্থান পেয়েছে। তাঁর সহজ সরল বানীতে মুগ্ধ হয়ে হিন্দু-মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষজন তাঁর অনুরাগী হন, গড়ে ওঠে এক সমন্বয়ী ও সৌভ্রাতৃত্বের মঞ্চ। কবীরের মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ নিয়ে হিন্দু রাজা বীর সিংহ ও মুসলমান বিজলী খাঁ পাঠানদের মধ্যে নিজ সম্প্রদায়ের বিধান অনুযায়ী শেষকৃত্য সম্পাদনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া হয়। কিন্তু মৃতদেহের আবরণ মোচন করে নাকি দেখা যায় কতকগুলি ফুল পড়ে আছে মাত্র। তার অর্ধেক মুসলমান ভক্তেরা মগহরে কবর দেন আর বাকি অর্ধেক হিন্দুরা কাশিতে এনে দাহ করেন। মধ্যযুগীয় ভক্তি সাধক কবীর ব্যক্তি জীবনে নিরক্ষর ছিলেন সত্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তেমন জ্ঞান লাভ না করেও তার সহজ সরল অর্থপূর্ণ উপমা ও দর্শন ও সমন্বয়বাদী চারিত্রিক মনোভাব, আজকের মন্দির মসজিদের দ্বন্দ্বে দীর্ন একদেশে এই সরল সত্য এখনও সমানভাবে জীবন্ত ও প্রনিধানযোগ্য।

যানলিপি ঃ নানদিক

মলয় বারিক

প্রাচীনকালে মানুষ যাতায়াতের পথ হিসাবে বেছে নিয়ে ছিল জলপথকে কাঠের গুড়ি ভাসিয়ে জয়যাত্রা শুরু করেছিল পথপরিক্রমার। চাকা আবিষ্কারের পর মানুষের গতি বাড়লো জীবনযাত্রার। তারই পরিবর্তিত আধুনিক সংস্করণ হল আধুনিক যন্ত্রচালিত যানবাহন। আজকের যুগে যাতায়াতের পথ হিসাবে যানবাহনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় -

i) জলযান
ii) স্থলযান
iii) বায়ুযান।

প্রাচীনকালে যানবাহনের গায়ে নানা ধরনের প্রতীক আঁকা থাকতো যে প্রতীক গুলি কেবল মাত্র যানবাহন গুলি কোন রাজার বা কোন দেশের তা বোঝাতে ব্যবহার করা হতো। বর্তমান কালে যানবাহন যেমন চিত্রিত হয়েছে, অনুরূপ ভাবে তার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে নানা ধরনের লেখা যেগুলি নানা বিষয়ের নানা ধরনের। আবার কখনো কখনো যান লিপি ও মানচিত্র একত্রিত হয়েও অনেক সময় নানা ধরনের বার্তা দেয়। যানবাহনের গায়ে লেখা লিপিগুলি কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি সেগুলি হল -

i) সচেতনমূলক।
ii) পরিবেশ ভাবনা মূলক।
iii) সমাজ স্বচেতনা মূলক।
iv) ক্রিড়া বিষয়ক।
v) মনসাত্ত্বিক।

সচেতনামূলক নানা ধরনের কথা লেখা থাকে যানবাহনে। এই লেখাগুলির স্থান অনুসারে লেখা গুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায় যথাক্রমে যানবাহনের বাইরের দিকে লেখা এবং ভেতরের দিকে লেখা। যানবাহনের বাইরের যে সচেতনা মূলক লেখাগুলি থাকে মূলত সেগুলি হল -

i) গেটে ঝুলিবেন না।
ii) ছাদে উঠিবেন না।
iii) ছাদে ওঠা দন্ডনীয় অপরাধ।
iv) Keep Safe Distance
v) Horn Maro
vi) Horn Please / যারা থম্ যা / থামুন।
vii) Safe Drive Save Life.

এই লেখা গুলির মধ্যে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের সতর্কতামূলক কথা বলা হয়েছে কারণ গেটে ঝুললে বা ছাদে উঠলে বিপদ ঘটতে পারে। লরির পেছনে লেখা থাকে 'দূরত্ব বজায় রাখুন', কারণ দূরত্ব বজায় না রাখলে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে তাই যানবাহনের এই লেখাটি পেছনের গাড়ির ড্রাইভার দেখতে পাবে এবং সচেতন হবেন। অপর দিকে Keep Safe Distance এবং Horn Maro কথাটি ও একই উদ্দেশ্যে লেখা গাড়ির ভেতরে যে সচেতনতা মূলক লিপি লেখা থাকে সে গুলি হল -

i) মালের দায়িত্ব আরোহীর।
ii) পকেট মার হইতে সাবধান।

এই লেখা গুলি গাড়ির ভেতরে থাকে তার কারণ - এই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি গাড়ির ভেতরে ঘটতে পারে। যাতে তা না ঘটে সে কারণে যাত্রীদের সচেতন করতে একথা গুলি লেখা হয়।

এছাড়া গাড়ির ভেতরে কিছু কথা লেখা থাকে সেগুলি আইন অনুসারে বাধ্যতা মূলক ভাবে লিখতে হয় বলে জানিয়েছেন গাড়ির ড্রাইভার কন্ডাক্টরেরা। বনহুগলী পাঁচলা লোকাল বাসের ড্রাইভার জানিয়েছেন পারমিটের সময় এই লেখা গুলি অনেক সময় দেখা হয়। সেই ধরনের লেখাগুলি হল - তিন বছরের উর্ধে পুরা ভাড়া লাগিবে, No Smoking, 'Sit- 39+1' 40 km/hour, প্রভৃতি। বিনা টিকিটে ভ্রমণ দন্ডনীয় অপরাধ। Ladies, Senior-Citizen, Handicapped Wall, West Bengal ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। এছাড়া গাড়ির চালকের নিজেদের সুবিধার জন্যে কিছু কথা লিখে রাখেন সে গুলি হল -

i) নির্দিষ্ট স্টপেজ ছাড়া বাস দাঁড়াবে না।
ii) ৫০-১০০ টাকার খুচরা নাই।
iii) দিচ্ছি দিচ্ছি করবেন না।
iv) টিকিট দেখাইয়া নামিবেন।

গাড়ির কন্ডাক্টরের কাছ থেকে জানতে পারলাম তাদের নিত্য দিন এধরনের অসুবিধায় পড়তে হয় তাই তারা এ ধরনের কথা গুলি লিখে রাখেন।

যানবাহনের লিপি সকল সময়ে যে সাবধানতার বার্তা হয়ে নিয়ে চলে নয়, নানা সময়ের নানা সামাজিক বিষয় ও তুলে ধরে এই লিপি। সমাজে পরশ্রীকাতরতা বিষয়টি প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় সে কারণে যানবাহনের গায়ে লেখা থাকে 'হিংসা কোরো না তোমারও হবে।' হিংসা কোরো না চেষ্টা করো' আবার কখনো কখনো পরশ্রীকাতরতা বিষয়টি মানুষের সহ্য সীমার বাইরে চলে গেলে সেও উল্টো পথে আক্রমণ করতে থাকে তখন সে বলে - 'দেখবি আর জ্বলবি, লুচির মতো ফুলবি।'

মালবাহি ট্রাকগুলি অনেক দূর থেকে মালপত্র নিয়ে এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্য পৌছে যায়। যারা এই ট্রাকগুলি চালায় তাদের প্রিয়জনেরা এদের ফিরে আসার প্রতিক্ষায় বসে থাকে। তাই একটি ট্রাকের পিছনে দেখলাম সচিত্র লেখা ''তুম কব আয়োগি'' আবার কখনো কখনো এই খেটে খাওয়া মানুষ গুলো নানা ধরনের বিশ্বাস সংস্কারে আবদ্ধ 'নজর লাগা কুদৃষ্টি' বিড়ালে রাস্তা কাটা প্রভৃতি বিষয়গুলি খুব গভীর ভাবে মেনে চলে, তাই গাড়ির পেছনে লেখা থাকে - ''বুরি নজর বালে তেরা মুকালা''।

যানবাহন হল বর্তমানে একটি বড় প্রচার মাধ্যম। সমাজ থেকে রাজনীতি জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরের নানা খবর এখন বয়ে বেড়ায় যানবাহন। বর্তমান কালে জন সংযোগ কে রক্ষার একটি বড় মাধ্যম যান লিপি। তাই আজ কোম্পানির বিজ্ঞাপন থেকে সরকারি নানা প্রকল্পের বার্তা দিয়ে যায় ভ্রাম্যমান যানবাহন গুলি।

ক্রিড়া প্রেমী মানুষ যানবাহনে বিভিন্ন প্রকারে ছবি ও ক্যাপশ্‌ন ব্যবহার করে থাকে যা থেকে বোঝা যায় যানবাহনের মালিক ও পরিবহন শ্রমিক অর্থাৎ যারা ওই যানবাহনে কর্মরত তাদের মনভাব যেমন কোন যানবাহনের গায়ে লেখা আছে -

“সৌরভ বাংলার গৌরব
সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল”।

মূলত ক্রিকেট থেকে কবাডি সবকিছু যে আজ মানুষের কাছে পরিচিত তা বোঝা যায় যানবাহনের এই লেখা থেকে।

মনস্তাত্বিকরা যানলিপির একটি বিশেষ দিক। যানলিপিতে আমরা দেখি কোথাও লেখা আছে “৮০ বন্ধু আবার দেখা হবে” অর্থাৎ যাত্রী অটো, বাস থেকে নেমে যাওয়ার পর যে মনটি তাকে ফিরে আসার বার্তা দিয়ে যায়। কোথাও লেখা থাকে ‘আজ যাত্রা শুভ হোক’ মনস্তাত্বিক দিক থেকে এই বার্তা যাত্রা পথের পথিককে মানসিক সুস্থিরতা ও শান্তি দেয় ফলে এই লিপি গুলির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই যানবাহনের ভেতরে বাইরে লেখা গুলি কেবল লেখার জন্য লেখা নয় এর সামাজিক সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

কলেজ গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ও ছাত্রদের গ্রন্থাগার বিমুখতার কারণ অনুসন্ধান

সাহীদ হাসান - (গ্রন্থাগারিক)

মোসা করিম - (গ্রন্থাগার কর্মী)

একটি গ্রন্থাগার কলেজের আত্মা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কলেজ বিদ্যার্থীর জীবনে সামগ্রিক যে প্রভাব ফেলে গ্রন্থাগার কলেজের অংশ হয়ে সেই প্রভাব ফেলতে পারে। তাই কলেজ গ্রন্থাগারকে কলেজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে পারে। কলেজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চরিতার্থ করার মৌলিক শর্ত হিসেবে কলেজ গ্রন্থাগার তথ্য বা জ্ঞান সরবরাহ করে যা বিদ্যার্থীর ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করে বর্তমান তথ্য ও জ্ঞান সমাজের সক্রিয় সদস্য হতে সাহায্য করে। কলেজ গ্রন্থাগার যথাযথ উপাদানে সজ্জিত ও সুশৃঙ্খলিত ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত কারণ গ্রন্থাগারই হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যের ধারক ও মানের সূচক। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিদ্যার্থী গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে সে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে নেয়। বলাবাহুল্য গ্রন্থাগারে সহস্র অভিজ্ঞতা কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়ে থাকে।

আত্মশিক্ষনের সহায়তা ঃ- কলেজ গ্রন্থাগারে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী নিজ রুচি অনুযায়ী পড়ার স্বাধীনতা পায় যা তাদের আত্ম শিক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে। প্রত্যেকের পক্ষে পছন্দ অনুযায়ী নিজ নিজ সংগ্রহ গড়ে তোলা সম্ভব না। কলেজ গ্রন্থাগার সহজেই সেই চাহিদা পরিতৃপ্ত করে।

পাঠস্পৃহা গড়ে ওঠে ঃ- শিক্ষাবিদরা মনে করেন ছাত্রদের পাঠে অনগ্রসরতার মূল কারণ পাঠ্যভ্যাসের অভাব। এ কারণে শিক্ষাবিদরা তত্ত্বাবধানমূলক পাঠের কথা বলেন। গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের উপস্থিতিতে এই পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা যেতে পারে। পুস্তক পাঠের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের কলেরবই বাড়ে না, তৈরী হয় অজানাকে আরো জানার অদম্য ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই হল পাঠস্পৃহা। কলেজ গ্রন্থাগার বিদ্যার্থীদের মধ্যে পাঠস্পৃহা গড়ে তুলতে পারে যা ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে।

শ্রেণিকক্ষের সহায়ক ও বিকল্প হিসেবে গ্রন্থাগার ঃ- সব সময় শ্রেণী কক্ষে যে পাঠদান করা হয় তার দ্বারা বিদ্যার্থীর কৌতুহল মেটে না এবং অনেক ক্ষেত্রে একটি বিষয়কে ঘিরে নিত্য নতুন আগ্রহ দানা বাঁধে। শ্রেণী কক্ষের এই অতৃপ্তি গ্রন্থাগারই মেটাতে পারে।

জ্ঞানের প্রসারতা ঃ- বিভিন্ন সময়ের মানুষের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ রূপে গ্রন্থাগারে সঞ্চিত থাকে। এই সমস্ত বই শুধু জ্ঞানই বাড়ায় না, এক দেশের সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য দেশের সভ্যতা সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটায়। অভিজ্ঞতার আদান প্রদানে ও মতামত বিনিময়ে গ্রন্থাগার ইতিবাচক ভূমিকা নেয়। এরই ফলস্বরূপ কোন বিপ্লব সংগঠনের পেছনে বই তথা গ্রন্থাগারের সদর্থক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

সহ-পাঠক্রমিক কার্যে সহায়তা ঃ-(Co-curricular activities) বিতর্ক, আলোচনা, বক্তৃতা ইত্যাদি সহ-পাঠক্রমিক কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

অবসর সময় ভালোভাবে অতিবাহিত করা ঃ- ছাত্ররা অবসর সময় গ্রন্থাগারে পুস্তক পাঠের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলে সময়ের অপচয় হয় না, সঙ্গে সঙ্গে সৃজনী শক্তির বিকাশ ঘটে এবং ইতিবাচক মানসিকতা গঠনে সহায়ক হয়।

নিয়মানুবর্তিতা শেখা ঃ- গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হয় কতগুলি নিয়ম মেনে। তাই গ্রন্থাগার ব্যবহারে ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা বোধ গড়ে ওঠে যার প্রভাবে ভালো চারিত্রিক অভ্যাস গড়ে ওঠে।

শিক্ষণ পদ্ধতির উপাদান হিসেবে গ্রন্থাগারের ব্যবহার ঃ- আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে ছাত্রদের স্বাধীন মতামত গড়ে তুলতে বিশেষ উৎসাহদানের কথা বলা হয়। এখানে শিক্ষক নির্দিষ্ট বই দিয়ে আলোচিত বিষয়বস্তুর উপর প্রত্যেককে নিজস্ব মতামত দিতে বলতে পারেন।

স্থানীয় ইতিহাস সংরক্ষণ ঃ- কলেজ যেখানে অবস্থিত সেখানকার পারিপার্শ্বিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং সে সম্পর্কে বিদ্যার্থীদের ধারণা গড়ে তোলা গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব।

তথ্য স্বাক্ষরতার প্রসার ঃ- (Information Literacy)

তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক জগতে সুষ্ঠভাবে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে গেলে একজন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা ও তার যথাযথ ব্যবহার করতে পারাকে তথ্য-স্বাক্ষরতা বলে। যুগোপযোগী পাঠ-সামগ্রী ও তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য-স্বাক্ষরতার প্রসার ঘটাতে পারে।

গণতন্ত্র-সুদৃঢ়করণ ঃ- আমরা গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। গণতন্ত্র তখনই সুদৃঢ় ও কার্যকরী হবে যখন জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের বই, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, সংবাদ পত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীরা সমসাময়িক ঘটনা, দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিষয়ে নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা সুচিন্তিত ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করে।

ভবিষ্যতের দিশারী ঃ- কলেজ জীবন শেষ করার পর কেউ বা উচ্চতর শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ করবে, কেউ বা কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। এই সংক্রান্ত তথ্য ও পরিষেবা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করা গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব।

গ্রন্থভিত্তিক রোগ নিরাময় পরিষেবা ঃ- গ্রন্থাগারিক ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক অবসাদ, উৎকণ্ঠা, বেকার সমস্যা, পরীক্ষাভীতি ইত্যাদি নির্দিষ্ট কিছু বই-এর সাহায্যে প্রশমিত করতে পারেন। এক্ষেত্রে ডেল কার্নেগী ও স্বামী বিবেকানন্দের লেখা ব্যক্তির বিকাশ ও মানসিক সমস্যা সমাধানের বইগুলি বিশেষ সাহায্য করে। তবে এই পরিষেবার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে গ্রন্থাগারিককে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

ছাত্রদের গ্রন্থাগার বিমুখতার কারণ ঃ-

অত্যধিক পরীক্ষাকেন্দ্রিক পড়াশুনা ঃ- বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পড়াশুনা মূলত পরীক্ষাকেন্দ্রিক। পরীক্ষা পাশের জন্য যে সব বই সাহায্য করে তার দিকেই শিক্ষার্থীদের শুধু ঝোঁক থাকে। পরীক্ষা ছাড়া শিক্ষার অন্যান্য ব্যাপক তাৎপর্যের কোন মূল্য থাকে না।

পরীক্ষায় ছোট ছোট প্রশ্নের প্রাধান্য ঃ-

বর্তমানের পরীক্ষা ব্যবস্থায় 'এক কথায় উত্তর' বা 'সঠিক উত্তর বেছে নেওয়া' ধরনের প্রশ্নের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার্থীর বিষয়ের উপর দক্ষতা যাচাই এর জন্য রচনাধর্মী প্রশ্নের প্রয়োজন। ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তরে পরিক্ষার্থীর দক্ষতা বা সৃজনশীলতা বিচার করা যায় না। রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর তৈরী করার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজন হত। আবার উচ্চ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য - শিক্ষার্থীর কোন বিষয়ের উপর স্বাধীন ও সুচিন্তিত মতামত গড়ে তোলা। গ্রন্থাগারের সঠিক ব্যবহার ছাড়া ঐ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

সহায়িকা বা প্রশ্ন / উত্তরের বই-এর রমরমা বিজ্ঞাপন ঃ-

পাঠ্যপুস্তক ছাড়া সহায়িকা বা প্রশ্ন / উত্তরের বই এর বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে বিদ্যার্থী এই ধরনের বই বেশী কেনে ও পড়ে। এ ধরনের বই গ্রন্থাগারে রাখা নীতিবিরুদ্ধ। এই সব বই পড়াতে পাঠ্যপুস্তক অবহেলিত থেকে যায়। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন লেখকের বই পড়ে উত্তর তৈরী করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না।

গ্রন্থাগারের প্রচারের অভাব ঃ- বিজ্ঞাপিত বস্তু অপেক্ষা বিজ্ঞাপনই বেশি মূল্যবান। বিজ্ঞাপন কোন বস্তুকে মানুষের চেতনার আবর্তে নিয়ে আসে এবং তা মূল্যবান করে তোলে। কলেজ গ্রন্থাগারের প্রচার না থাকায় তার ব্যবহার বাড়ছে না। এই প্রচার গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষকদের উদ্যোগেই সম্ভব। পাঠচক্রের আয়োজন, পুস্তক প্রদর্শন, মনীষীদের জীবন আলোচনা ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রন্থাগারের ব্যবহার বাড়ায়।

ইন্টারনেট ও বিনোদনমূলক মাধ্যম ঃ- ইন্টারনেট ব্যবহার বাড়ায় গ্রন্থাগার ব্যবহারী সংখ্যা কমছে। ইন্টারনেট যে কোন বিষয় 'খোঁজ' করলে পর্যাপ্ত তথ্য সহজেই পাওয়া যায়। সমস্যা - অনেক তথ্য একসঙ্গে চলে আসে। সেই তথ্য সমুদ্রে অপ্রয়োজনীয় তথ্যকে এড়িয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যটিকে খুঁজে পাওয়া সব সময় সহজ হয় না। তখনই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা।

বিনোদনের উপকরণ হিসেবে বই, পত্র-পত্রিকা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। বিনোদনমূলক বিভিন্ন গণমাধ্যমের দাপটে সেই জনপ্রিয়তা ক্রমশ হ্রাসমান।

নারী ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা

মধুমিতা নস্কর

বাংলা (অনার্স), প্রথম বর্ষ

তোমার মন নাই কুসুম... ?
মন ? মন কী কখনও চেয়েছ পুরুষ ? যে
হঠাৎ মনের খবর নিচ্ছ ? এতদিন কোথাও
কোন ভাবে মন খুলে নারীর গোপন কোণটিকে
তো চিনতেই চায়নি তোমাদের ক্ষয়িষ্ণু
মূল্যবোধ ! তাই সংসারের চৌকাঠে আজও
আমরা সেই বিপন্নতার প্রতীক।

আমরা সকলেই জানি যে, নারী হল সেই যাকে যে পাত্রে ঢালা হয় সে পাত্রের আকার ধারণ করে অর্থাৎ জলের মতো। কথাটা হয়ত ঠিক, তবে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা প্রমাণ করেছে যে তারা কারও হাতের পুতুল নয়। কিন্তু তারা চঞ্চল, অদ্ভুত তাদের জীবনে উচ্ছ্বাস, আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, রাগ, অভিমান সবই বৈচিত্র্যে ভরা। তবে নারী মনের সঙ্গে আবেগ ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত কারণ মেয়েদের আবেগের প্রকাশ বৈচিত্র্য এবং তীব্রতা দুটোই পুরুষদের তুলনায় বেশি। নারীকে আমরা প্রকৃতির সাথে তুলনা করে থাকি। কবির কলমে বারবার নারীর সাথে প্রকৃতির তুলনা করা হয়েছে, অর্থাৎ নারী আর প্রকৃতি যেন মিলেমিশে একাকার। তবুও এই নারীর মর্যাদা হননে যেন একদল নৃশংস মুখোশধারী ভদ্রলোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে সেই আদি যুগ থেকে এই একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। আর এ ধারা যে ভবিষ্যতে বহমান হবে না তা একান্ত জোর দিয়ে বলার সাহস আমরা কেউই রাখি না।

আমরা একবিংশ শতাব্দীর ঝাঁ চকচকে দুনিয়ায় পা রেখেছি। তাই মহিলারা এখন স্বনির্ভরতায় বিশ্বাসী। কিন্তু আগের যুগটা ছিল পর্দানসীন। সমাজ গঠিত হয় নারী ও পুরুষের মিলিত প্রয়াসে। কিন্তু আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যতই বলা হোক না কেন নারী স্বাধীনতার কথা তবুও এখনও মানুষের মনে পূর্বের সামন্ত ধারণা চোরা স্রোতের মতো বইছে। নারীরা পরাধীনতার বেড়ি থেকে শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে এখনও বেরোতে পারেনি বরং বলা চলে বেরোতে দেওয়া হয়নি আর দেয়নি সমাজের অস্থির ও ভোগে মত্ত কিছু কুসংস্কারচ্ছন্ন মানুষজন। সমাজ এখনও মেয়েদের পঙ্গু করে রেখেছে। ভারত পথিক বিবেকানন্দ বলেছিলেন - 'ভারতের জাতীয় জীবনের দুটি মহাপাপ হল - সাধারণ মানুষকে অবহেলা করা এবং নারীজাতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন'। তো মানুষ মহাপাপের খেলায় ব্রতী হয়েছেন কোমর বেঁধে।

এখনও সমাজ মেয়েদের মেয়ে হিসাবে দেখতে ভোলেনি। সমাজের চোখ রাঙানি তো সেই আদি কাল থেকেই বহমান। আজও আমাদের সমাজে কোন মেয়ে নিজের পছন্দ অনুযায়ী স্বধর্ম কিংবা অন্য ধর্মের কোন ছেলেকে বিয়ে করতে চায় তাহলে জিঘাংসা এতটাই যে নিজের সন্তানকে বা নিজের বোন কে কখনও গলা টিপে বা কখনও আরও বীভৎস কোনও পন্থায় প্রাণ নিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। আদি যুগে কন্যা সন্তান হলে নদীতে ভাসানো হত আর এই একবিংশ শতকে কন্যাভ্রূণ হত্যা করা হয়। সে সময়ে ছিল সতীদাহ প্রথা ও বাল্য বিবাহ। যদিও প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে এখনও বাল্য বিবাহ সম্পূর্ণ ভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আর তার বদলে এই যুগে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি ঘটলেও আড়ালে বধূ নির্যাতন তো বটেই এমনকি বধূ হত্যাও চলছে সমানে। সঠিক পণ না পেলে এই সভ্য যুগেও জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয় ঘরের বউকে। দুর্ভাগ্য নারীর এই যে আজও সমাজ কিছুতেই নারীর নিজের মতো বাঁচাকে মেনে নিতে পারেনি।

এটা আমাদের সমাজ, কারণ তারা মনে করে মেয়েরা যেন মঙ্গল গ্রহের জীব কারণ এখানে ধর্ষককে দোষ না দিয়ে ধর্ষিতার উপর আঙুল তোলা হয় যেন দোষটা তারাই করেছে। Chocolate -এর প্রলোভনে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে আমাদের সমাজের শিশুরা। আজকের সমাজে মেয়েরা প্রথম যৌন নিগ্রহের স্বীকার হয় তার পরিবার বা পরিচিতদের কাছে। কাকা, বাবা, শ্বশুর, পাশের বাড়ির দাদা অনেক সময় এই ধর্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই সমাজের হিংসাত্মক ও নৃশংস লোকগুলোর থেকে কোন বয়সের নারীরাই রক্ষা পায় না। সে এক বছরেরই হোক বা একশ বছরের।

অধীনতা

সুমন পাল

বাংলা (অনার্স), প্রথম বর্ষ, রোল- ৩৪৫

সাল ১৯৪৫, ভেবেছিলাম আমরা এবার স্বাধীনতা পেতে চলেছি এবং ১৯৪৭ সালে আমরা তা পেয়েও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই স্বাধীনতা কোথাও একটা অধীনতার আহ্বান জানিয়ে দিল। পাশাপাশি ১৯৫০ সালে বাবা আম্বেদকর সংবিধান চালু করলেন - গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি। এক মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলাম যে আমরা এবার স্বাধীন হতে পারলাম। কিন্তু তা অধীনতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তৎকালীন সমাজে সমাজ বিরোধী মূলক কাজের প্রভাব বিস্তার করেছে। বেড়েছে নারীদের উপর চরম অত্যাচার। বিশেষ করে সমাজে নিম্নজাতি শ্রেণীর উপর প্রবল অমর্যাদা ও অত্যাচার লক্ষ্য করা যায়। তাদেরকে যেন রাস্তা-ঘাটে-ফুটপাথে পড়ে থাকা কুকুরদের সমতুল্য করা হয়েছে। যারা কিনা স্বপ্ন দেখতে দেখতে কোলকাতার ফুটপাথে না খেতে পেয়ে হুমড়ি খেয়ে মরছিল। বিদেশী শাসনের অত্যাচারের পরে, এ আরেক দুর্ভিক্ষ পীড়ন। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ভিড়, একে অপরের প্রতি বেড়ে চলল হিংসা বিদ্বেষ। অপরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা না ভেবে চলল মারামারি, কাটাকাটি এবং খুনোখুনি পর্যন্ত বাদ দিতে দ্বিধা করেনি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে চলে আসল মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ। চলে আসল স্বাধীনতার পরিবর্তে অধীনতার মার। বর্তমান সমাজ এখনো বিষময় স্বাধীন হয়েও অধীনতায় রোগাক্রান্ত। এখনো চলছে স্বাধীনতার অনুসন্ধানে।

একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ ও আমরা

রাজীব আলম

বাংলা (অনার্স), প্রথম বর্ষ, রোল- ২০৯

সেদিন বাসযাত্রা করতে গিয়ে একটা অল্পবয়সী লজেন্স বিক্রেতা (১৪ বছরের নীচে) জিজ্ঞাসা করলো, দাদা আপনি ভালো আছেন তো? প্রত্যুত্তরে আমি বললাম- আমি খুব ভালো আছি। উত্তর শুনে ছেলেটি বললো, তাহলে আপনি তো একবিংশ শতকের শিক্ষিত, ভদ্র, নিষ্ঠাবান, সুবিধাবাদী দেশভক্ত নাগরিক। আমরা কিন্তু দাদা একদম ভালো নেই। সেদিন ওই কথাগুলোর মধ্যে 'একবিংশ শতক' ও 'দেশভক্তি' কথাগুলির অর্থ অন্বেষণে বসলাম।

আর্যজাতির এদেশে আসার পর অর্থাৎ ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ভারতীয় সভ্যতার সূত্রপাত বলে মনে করা হলেও ভারতীয় সভ্যতায় সূত্রপাত হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে আর্যদের আসারও ১৫০০ বছর পূর্বে অর্থাৎ প্রায় ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষের আয়তন রাশিয়া বাদে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের আয়তনের প্রায় সমান অথবা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় কুড়িগুণ। দেশের বিশলতা শুধু-এর আয়তনে নয় - বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ জাতি, ভাষাভাষি মানুষ সম্প্রদায়ে। কবির কথায় - 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান' অথবা 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'। এই ঐতিহ্যের অংশীদার ভারত প্রাচীনকাল থেকেই নিজের কোলে ঠাঁই দিয়েছে অপরকে ও নিজের ঐতিহ্যকে বিলিয়েছে উদার ভাবে।

দেশের দামাল ছেলেগুলো নাকি বলে সাম্প্রতিক কালে কানাইয়া কুমার, উমর খালিদদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। [Against Article-19 (Freedom of speech and expression)] আচ্ছে দিন নাকি এসে গেছে আজ? ([Hunger Index 100 out of 118 IFPRI) নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে দেশবাসী আজ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত। Inter Cast Marriage - আজ নতুন নাম 'লাভ জোহাদ'। বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা ও রাজ্য সরকারের চাকরির পরীক্ষায় সুযোগ পাওয়া দরিদ্র মেধাবী ছেলেগুলো আজ মধ্যপ্রদেশে মরে ব্যাপন-এ। [Against Article- 16] সৃজনশীল কাজে বাধা দেওয়া হয় 'পদ্মাবতী' থেকে 'পদ্মাবত' নামে। দেশের আগামী ৫ বছরের ভবিষ্যৎ স্থির হয়ে 'ভালো দিন' আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ছাত্ররা আজ সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ভুলে পাসের দাবিতে উপাচার্য ঘেরাও করে।

নারীদের কর্মক্ষেত্রে অথবা সাবলম্বী হওয়াতে সাহায্য না করে সবাই যেন তাদের পাত্রস্থ করাতে ব্যস্ত 'শাদি শাগুন' অথবা রূপশ্রী নামে, শ্লীলতাহানীর অভিযোগ জানাতে গেলে পোষাক সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়। তবে আশাও আছে 'কন্যাশ্রী', 'মুদ্রা যোজনা' ও 'নয়া উড়ান'-এর মতো প্রকল্প আজও 'নির্ভয়া' বা 'পার্কস্ট্রিটের' মতো ঘটনা ঘটলে ছাত্র সমাজ গর্জে ওঠে বিচারের দাবিতে (J.N.U ও J.U মুখ্যত)।

অল্পবয়সী ছেলেটির চাহিদার ভারতবর্ষ ছিল - জাতি-ধর্ম বিভেদ মুক্ত, সম্পদের অসম বন্টন মুক্ত। প্রতিশ্রুতিমুক্ত, শিশুশ্রমিক, বেকারত্বহীন ও ধর্মীয় সংকীর্ণতা মুক্ত সমাজ। যেখানে জাতি-ধর্ম ভেদাভেদ ভুলে মানুষ মানুষের পাশে রবে।

এ ভারত যেন মধ্যযুগীয় বর্বরতায় পূর্ণ কোন এক মধ্য প্রাচ্যের দেশ। কিন্তু আপনিও তো আমার মতো ভদ্র শিক্ষিত, নিষ্ঠাবান, দেশভক্ত, নাগরিক তাই নীরবতায় প্রাধান্য পাবে। হতে যাবেন না পরবর্তী গৌরি লঙ্কেশ। সে বলে - Tolerance is a sin in your Lexicon.

আপনি ভালো আছেন তো?

সন্দীপের স্বপ্ন

ড. বীর বিক্রম রায়

পেঁয়াজকলির মতো লমলমে শীত পড়েছে। এই সময়টা শহরটার সারা গায়ে খড়ি ফুটে ওঠে। আর সন্দীপের মনটা হু হু করে ছুটে চলে যায় গ্রামে মামার বাড়িতে। ওখানে সে বড়ো হয়েছে। এখন নিশ্চয়ই ওখানে খেতের জমিতে ফুলকপির যৌবনোদ্গম হচ্ছে, নুনছাল ওঠা নতুন আলু আলপথের ধারে ধারে একে অপরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, দুধ সাদা মুলোর রগে রগে লজ্জার লাল রং লেগেছে, সবুজ হিজাবের আড়াল থেকে নারকোলি বাঁধাকপির সুডোল মুখ দেখা যাচ্ছে আর কড়াইশুঁটিরা গর্ভবতী হয়ে উঠেছে। মাঠে মাঠে ধানকাটা সারা। খড়ের গোড়াগুলো জেগে আছে যেন মামার গালে না-কাটা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সন্দীপের ছেলেবেলায় মামা বাপ-মা মরা শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে আদর করে মামার গালে গাল রাখতো সন্দীপ। সেই দাড়ির খরখরে পরশ এখনও যেন সন্দীপের গালে লাগে। মামা মারা যাবার পর সন্দীপের গ্রামের বাড়ি যাওয়াই বন্ধ হয়ে গেছে। মামাতো ভাই এমনিতেই সন্দীপকে চক্ষুশূল ভাবতো। তারপর স্কুল সার্ভিস দিয়ে ডোমকলের স্কুলের চাকরি পাবার পর মামাতো ভাইয়ের ঈর্ষা যেন শিমুলতুলোর মতো ফেটে ফেটে ছড়িয়ে পড়লো। আর তার জেরে সন্দীপকে বাক্সপ্যাঁটরা সমেত মামাবাড়ি অর্থাৎ গ্রামছাড়া হতে হলো।

লাগোয়া শহর বলতে বহরমপুর। সন্দীপ বহরমপুরে বাড়ি ভাড়া নিল। বহরমপুর সন্দীপের এমনিতে খারাপ লাগে না। আশেপাশের অনেক গ্রামের মানুষ বহরমপুরে এসে বাড়ি করে বসবাস করছেন। অনেকেই তাদের গ্রামের জমিজমা বিক্রি করে শহরে পাকাপাকি আস্তানা গেড়েছেন। এর তার সাথে কথা বলে সন্দীপ জানার চেষ্টা করেছে শহরবাসী হবার পরও তারা গ্রামের টান অনুভব করেন কি না। অধিকাংশ মানুষই বলেছেন যে ছেলেমেয়ের পড়াশোনা চাকরি বাকরির জন্য শহরে না এসে উপায় নেই। কেউ কেউ আবার সূক্ষ্মভাবে এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে গ্রামে সবসময়ই একটা চাপা সাম্প্রদায়িক টেনশন থাকে। শহরে অন্ততঃ সেটা নেই। মামাবাড়ি থাকার সময় স্কুলে সন্দীপের অনেক মুসলিম বন্ধু ছিল। পাড়াতেও ছিল। তাদের কেউ কেউ এখনও যোগাযোগ রাখে। কই, তার তো কোনদিন এরকম মনে হয়নি! তবে শহরে এসে একটা জিনিস সন্দীপ খুব বুঝতে পারছে যে শহরের মুসলিম মানুষরা নির্দিষ্ট দু-এক জায়গাতেই জমি কিনে বাড়ি করেছেন। ফলে শহরের কেন্দ্র থেকে একটু দূরে পুলিশ লাইন, কুমার হোস্টেল এইসব জায়গার পাশে একটা ঘেটো মতো তৈরী হচ্ছে। সন্দীপের স্কুলের সহশিক্ষক মফিজুল। মুক্তমনা পুরুষ সে; বিয়েও করেছে হিন্দু পরিবারে। কিন্তু সেও যখন বাড়ি করলো বেছে নিল ঐ বিশেষ জায়গাটাকে। অজুহাত দিল শহরের অন্যত্র জমি না পাবার। সন্দীপের এখন সত্যি সত্যিই মনে হচ্ছে গ্রামে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে আর শহরে সংখ্যালঘু মুসলিমরা নির্দিষ্ট দু-একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। কোথাও কি অস্তিত্বের কোন সংকট তৈরী হচ্ছে?

ডোমকলের স্কুল সেরে ফেরার পথে পঞ্চাননতলা রেলগেটের কাছে বাসটা প্রায় প্রতিদিন ২০-২৫ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে। বিকেলের লালগোলা প্যাসেঞ্জার এই রেলপথে যায়। এখানে একটা ফ্লাইওভারের প্রয়োজনীয়তা কেউ কি ভাবে না? শহরে ঢোকার পথে রেলগেটের রুদ্ধদ্বারে বাস-ট্রাক-লরির ক্রুদ্ধ গর্জন, রিক্সা-ঠেলার ভেঁপুর কান ফাটানো আওয়াজ, কান মাথায় মাফলার জড়ানো হেলমেট বিহীন বাইক বাহিনীর অস্থির আস্ফালন, পথচলতি মানুষ জনের কোলাহল - এই সব উপেক্ষা করে আধো তন্দ্রায় বাসের ছেঁড়া সিটের ওপর বসেই সন্দীপ মনে মনে পৌঁছে যায় তার ছেলেবেলার গ্রাম বেগুনবাড়ি। ওখানে চাষের সব প্রান্তর এখন হয়তো সরষে ফুলের হলদে রঙে ভেসে যাচ্ছে আর বসন্তের সবুজ পাতাভরা গাছগুলো ধীরে ধীরে শীতের ধুলোমেখে গেরুয়া হয়ে উঠছে।

আধো ঘুমেই কখন বাস ছেড়ে দেয়। বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে চায়ের দোকান থেকে মাসকাবারি সাইকেল নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয় সন্দীপ। একটুখানি সাইকেল চালিয়েই সে যেন বুঝতে পারে তার গ্রাম্য ফুসফুস শহরের এই ধুলোর পরত লেগে লেগে হাঁফিয়ে উঠছে। কিন্তু তার বাসাবাড়িতে রেখা আর তুতুন তার পথ চেয়ে বসে আছে। প্রতিদিনের মতোই রেখা জিজ্ঞাসা করবে - 'কি গো, এতো দেরী হলো?' আর তুতুন আধো আধো গলায় আবদার করবে - 'বাব্বাই, খেলতে চলো না!' সাইকেলে দম দেয় সন্দীপ।

সন্দীপের বৌ রেখা কলকাতার নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে। সে কোনদিন গ্রাম দেখেনি, দেখতে চায় ও না। কলকাতার বস্তিবাসীদেরও শহুরে অহংকার থাকে বোধহয়। বহরমপুরে বিয়ে হয়ে এসে রেখা প্রথম প্রথম খুবই মনমরা হয়ে থাকতো। তুতুন হবার পর অবশ্য অনেকটাই মানিয়ে নিয়েছে। সন্দীপ মাঝে মধ্যে রেখাকে তার গ্রামবেলার গল্প বলে। রেখা কখনও শোনে, কখনও শোনে না। তবে সন্দীপের ওপর রাগ হলে ওকে গাঁইয়া বলে আনন্দও পায়। সন্দীপ একদম রাগ করে না। বরং বলে - 'শিকড় ভুলো না, বরং ছড়াও।' আর শুধু স্বপ্ন দেখে আরেকবার গ্রামে যাবার। গ্রামে থাকার।

সুযোগটা হঠাৎ করেই চলে এলো। প্রদীপ সন্দীপের এক বয়স্ক ছাত্র। কোনও একটি মুক্ত বিদ্যালয়ে পড়ে। সন্দীপকে ভালোবাসে, ওর কাছে প্রায় রোজই পড়া বুঝতে আসে। তুতুনের সাথে ভারি ভাব ওর। অনেক সময় সন্দীপের ফিরতে দেরী হলে ও-ই তুতুনের ব্যাটবল নিয়ে তুতুনকে মাঠে নিয়ে যায়। রেখা মজা করে বলে সন্দীপ-প্রদীপ যেন কুম্ভ মেলায় হারিয়ে যাওয়া দুই ভাই। গোরাবাজারে এক মেসে থাকে প্রদীপ। তবে প্রায় সারাদিনই সন্দীপের বাসায় পড়ে থাকে। দেখতে দেখতে সন্দীপের ছোট্ট পরিবারের এক সদস্যই যেন হয়ে উঠেছে সে।

প্রদীপই একদিন বললো হরিহর পাড়ায় ওর এক বিধবা দিদি থাকেন। গ্রামের বাড়িতে চাষ-বাস-বাগান এসব নিয়েই থাকেন। সন্দীপের মুখে ওর গ্রামের গল্প শুনে সেই বললো - 'দাদা, চলুন না, বৌদি আর তুতুনকে নিয়ে একদিন দিদির বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। আপনার ভালো লাগবে। একেবারে অজ পাড়া-গাঁ।' বলেই রেখার দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ একটা হাসি দিল। সন্দীপ তো এক পা বাড়িয়েই ছিল। রেখাও অরাজি হল না। তবে রেখার প্রথম আপত্তি ছিল বাথরুম নিয়ে। কিন্তু পরে যখন বুঝলো একদিন অন্ততঃ একঘেয়ে রান্নাবান্না আর তুতুনের দেখভাল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তখন সে রাজি হয়ে গেল। আর তুতুন তো প্রদীপ কাকুর সাথে বেড়াতে যাবে বলে উৎসাহে টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকলো।

বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে সেদিন সন্দীপ ডোমকলের বাস না ধরে হরিহর পাড়ার বাসে উঠলো সকলকে নিয়ে। হরিহর পাড়া নেমে প্রদীপ কোথা থেকে ধরে নিয়ে এলো একটা এক্কাগাড়ি। রেখা একটু ভয় পেলেও তুতুনের আর আনন্দ ধরে না। ঘোড়াগাড়ি চেপে প্রশ্নে প্রশ্নে সে সহিসকে হয়রান করে তুললো। 'ঘোড়াটার চোখ বাঁধা কেন? ঘোড়া কি খায়? গাড়িটা টানতে ওর কষ্ট হচ্ছে না? ঘোড়া যখন গাড়ি টানে না তখন কি করে? কোথায় থাকে?' এসব নানা প্রশ্ন।

ক্রমে পাকা রাস্তা ছেড়ে গাড়ি এসে নামলো কাঁচা রাস্তায়। প্রচুর ধুলো উড়িয়ে চলছে ঘোড়ার গাড়ি। চতুর্দিকে শুধু সবুজ খেত। গেরুয়া মোরামের রাস্তা যেন দুধারের সবুজকে এসে পরস্পরের সাথে মিশে যেতে বুক পেতে বাধা দিচ্ছে। ঘোড়াগাড়ির দুলুনিতে আধো তন্দ্রাচ্ছন্ন সন্দীপ যেন মনে মনে ফিরে গেল তার ছেলেবেলার গ্রাম বেগুনবাড়িতে।

এক অদ্ভুত ভালোলাগার ঘোর থেকে যেন এক ধাক্কায় জেগে উঠলো সন্দীপ রেখার চিৎকারে - 'এই দাঁড়াও দাঁড়াও। রাস্তার ধারে কতো সব্জি ফলেছে। আমি তুলবো।' বলেই প্রায় চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে গেল সে। মায়ের দেখাদেখি তুতুনও এক ছুটে নেমে দে দৌড়। সন্দীপ বুঝলো রেখার দোষ নেই। কলকাতার মানুষ তো শাকসব্জি গাছে দেখে না, দেখে বাজারে। কিন্তু সে এটাও বুঝতে পারছে যে প্রদীপ খুব অস্বস্তিতে পড়েছে। কার না কার জমি। সেখানে নেমে গিয়ে শাকসব্জি তুলতে শুরু করলে জমির মালিকই বা কি বলবে? মা-ছেলেকে পাশের ঢালু জমিতে নেমে যেতে দেখে খুবই শঙ্কিত গলায় প্রদীপ বললো - 'জানেন তো দাদা, এখানে কয়েক বছর আগেই একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে। জমির মালিকরা সব মুসলিম। ওদের অনুমতি ছাড়া জমিতে ঢুকলে আর রক্ষা নেই।'

আর দেরী না করে সন্দীপ এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে ছুটে ঢুকে পড়লো পাশের জমিতে। চিৎকার করে বলতে লাগলো - 'রেখা-তুতুন, ওদিকে যায় না। এদিকে ফিরে এসো।' কিন্তু কে শোনে কার কথা? রেখা যেন চারপাশের এই সবুজের সমারোহে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। ও আর তুতুন সমানে ছুটোছুটি করে একবার বেগুন, একবার টম্যাটো আর একবার কড়াইশুঁটি টপাটপ গাছ থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে। রেখা রাখছে তার শাড়ির কোঁচড়ে আর তুতুন ওর জ্যাকেটের পকেটে।

পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরা বেগুন গাছের কাঁটা এড়িয়ে এড়িয়ে ওদের কাছে পৌঁছে যাবার আগেই সন্দীপ শুনলো দূর থেকে ভেসে আসছে একটা 'হেই হেই' শব্দ। ওর বুকটা ধক্ করে উঠলো। দূরে তাকিয়ে দেখলো আলপথ দিয়ে একজন ছুটে আসছে মুখে শব্দ করে করে - 'হেই হেই'। লোকটার মাথার উপর ডানহাতটা তোলা। আর তাতে একটা হেঁসো প্রখর সূর্যালোকে মাঝে মাঝেই ঝল্‌সে উঠছে।

সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সন্দীপ - 'প্রদীপ, শিগ্‌গির এসো। কে যেন কাস্তে হাতে এদিকেই ছুটে আসছে। সব্বোনাশ হয়ে গেল।' প্রদীপও ঘোড়াগাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে সজোরে ডাকতে শুরু করলো - 'বৌদি...তুতুন.... ওদিকে যেও না।' ওদের সমবেত চিৎকারে ভীত সন্ত্রস্ত রেখা হঠাৎ তার কোঁচড় থেকে সব সব্জি ঝেড়ে মাটিতে ফেলে দিল। আর 'তুতুন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে তার মায়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। প্রদীপকে গাড়ি থেকে নেমে আসতে দেখে সাহস পেয়ে সন্দীপ এক ছুটে গিয়ে রেখা আর তুতুনকে আড়াল করে দাঁড়ালো। ততোক্ষণে লোকটি ছুটতে ছুটতে কাছে এসে পড়েছে। মাথায় গামছা বাঁধা দাড়িওয়ালা লুঙ্গি পরা কৃষকটিকে দেখেই সন্দীপ বুঝলো যে কোন মুসলিম চাষীর জমিতে তারা বিনা অনুমতিতে ঢুকে তার কষ্টের ফসল ছিঁড়ে খুঁড়ে নষ্ট করে তার ক্ষতি করেছে। তাই নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাত জোড় করে সন্দীপ বলে উঠলো - 'চাচা, আমাদের মাফ করে দিন। আপনার যা ক্ষতি হয়েছে আমি তা পূরণ করে দিচ্ছি। আমি ডোমকল স্কুলের শিক্ষক আর এরা আমার পরিবার। বহরমপুরে থাকি।'

এই শীতেও অনেকটা ছুটে আসার ফলে লোকটির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মাথার গামছটা খুলে মুখ-কপাল মুছে একগাল হেসে লোকটি বলে উঠলো - 'চাচাও ডাকবে আর পয়সাও দেবে তাই হয় নাকি মাস্টার? আমি তো দূরে যে ' বুঝতে পারি নি। খেতির মধ্যে লড়াচড়া দেখি ভাবি যে ছাগল-গোরু ঢুকিছে। তো, এট্টু ঠাহর করে দেখতি বোঝলাম তোমরা গাড়ি থেকে নেমি খেতির মধ্যে ঢুকিছো। তোমাদিকে এট্টু টাটকা সব্জি কেটে দেবো বলি হেঁসোটা নি' ছুট্টি আসতেছি। আর রজব আলি আসছে বস্তা নি। ওতে করে তুমাদিগে ক'টা কপি-বেগুন মটর তুলি দেবো।'

ভয়ে আর ঘটনার আকস্মিকতায় সন্দীপ খেয়ালই করে নি যে লোকটির পিছনে পিছনেই ছুটে এসেছে একটা ছেঁড়াখোঁড়া সোয়েটার পরা তুতুনেরই বয়সী একটি ছেলে। তার ছোট্ট হাতে একটা পলিথিনের বস্তা। লোকটি বাচ্চাটিকে দেখিয়ে বললো - 'এই হলো আমার লাতি রজব আলি।' তারপর তুতুনের দিকে আঙুল তুলে ওকে দেখিয়ে বললো -'শোন রজব আলি। তুমার এই দোস্তকে নিয়ে যাও। কটা মটর ছিঁড়ি উয়ার পকিটি দ্যাও। দেখো, বেগুন কাঁটায় ছেলিটার হাত-পা যেন খাম হইয়ে না যায়। আর দেখো, আমার মায়ের কোল থিকি যে সব্জি গুলা ভুঁয়ে পড়ি গেল সেগুলা তোমার এই বস্তায় তুলি দাও।'

এই মানুষগুলোকে ছেলেবেলা থেকে চেনে সন্দীপ। এদেরই মাঝে নিবিড় আত্মীয়তায় বড়ো হয়েছে সে। সে হাত দিয়ে রেখাকে অভয় দিল। রেখা এতোক্ষণে ভয়-বিস্ময়-অবিশ্বাস মিশ্রিত অনুভূতি সারা শরীরে মেখে নিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিল। সন্দীপের ভরসায় ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এলো। লোকটি একগাল হেসে বললো - 'ভয় পেওনি মা জননী। আমি তুমার গাড়িতি কিছু টাটকা সব্জি তুলি দিতিছি।' ততোক্ষণে রজব আলি এক ছুটে গিয়ে তুতুনের হাত ধরে আল্‌তো টান দিয়ে বললো - 'আসো, আমার সঙ্গি আসো।'

এক সুগভীর প্রশান্তি আর ভরসায় রেখা সন্দীপের হাতে হাত রাখলো। হাত ধরাধরি করে ওরা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলো গ্রাম-শহর-সহিষ্ণুতা - অসহিষ্ণুতা-জাতপাত-সম্প্রদায় সব ছাড়িয়ে দেশের দুই ভবিষ্যৎ হাত ধরাধরি করে বেড়ে উঠছে গ্রামের মাটিতে।

আত্মহত্যা না হত্যা?

অপরূপ চক্রবর্তী

ডিসেম্বরের শেষদিক - কলকাতা শহরে প্রচন্ড কনকনে হাড় কাঁপানো শীত পড়েছে। সন্ধ্যাবেলা অন্ধকারটাও শীতের মত জমাট বেঁধে উঠছে। এই পরিবেশে চঞ্চলের ২০/১ সি হাজরা রোডের বাড়িতে আড্ডার আসর ও জমে উঠেছে। গরম বেগুনী ও গরম চা সহযোগে খাসগল্পে মত্ত চঞ্চল ও সৌমেন। এমন সময় সৌমেনের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। ফোনে কথা বলতে সৌমেনের মুখের চেহারাটা গেল পাল্টে। কথা শেষ করে সে বলল - চঞ্চলদা আমাকে এখনই একবার চেতলা যেতে হবে, চঞ্চল - কি ব্যাপার? সৌমেন - আমায় ফোন করেছিল চেতলা থানার ইনচার্জ আমার বন্ধু মহিম দত্ত। ওর এলাকায় কি এক রহস্য জনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সুই সাইডের কেস - কিন্তু কোন কারণে মহিম তেমন নিশ্চিত হতে পারছে না। তাই আমার সাহায্য চাইছে। একবার যাবে কি? চঞ্চল - গেলে হয়। হাতে আপাতত কোন কাজ নেই। একটু না হয় ঘরের খেয়ে বনের মোষ-ই তাড়াই।

অকুস্থান চেতলা পার্ক। একটা পে অ্যান্ড ইউস টয়লেটের গেটের সামনে দুজন কনস্টেবলকে দেখে সৌমেন এগিয়ে নিজের পরিচয় দিলে ওরা ভেতরে যেতে বলল। ওই গেট দিয়েই চেতলা পার্কে প্রবেশ করে সামনের দিকে একটা সরু রাস্তা ধরে কিছুটা অগ্রসর হতে ইউনিফর্ম পরিহিত লম্বা মত ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তাকে দেখে সৌমেন-চঞ্চলদা, এই মহিম আর মহিম ইনি চঞ্চল চক্রবর্তী। মহিম উল্লাসের সঙ্গে - কি সৌভাগ্য আপনি এসেছেন - আসুন আসুন, আপনার অনেক কথা সৌমেনের মুখে শুনেছি। চঞ্চল - ব্যাপারটা কি? একটু খুলে বলুন তো। মহিম - আপনারা আসুন আমার সঙ্গে। বলে সামনের একটা ক্লাব ঘরে প্রবেশ করল। ক্লাবের নাম চেতলা অ্যাথলেটিক ক্লাব। ক্লাব ঘরের মধ্যটা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত হওয়ায় সব কিছু নজরে আসছে। বেশ বড় আকারের ঘরের দেয়ালগুলি জুড়ে বিভিন্ন মহামানব ও রাজনৈতিক নেতাদের ছবি আর ক্যালেন্ডার। গোটা চারেক স্টিলের আলমারী, ঘরের এক কোণায় ক্যারাম খেলার সরঞ্জাম রাখা, গোটা দুই টেবিল, খান দশেক চেয়ার ঘরের মধ্যে ছড়ানো ছেটানো অবস্থায়। এরই মধ্যে এক ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়ল। একটা চেয়ারের উপর উপবিষ্ট এক ভদ্রলোকের দেহের উর্দ্ধাংশ সামনের টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে আছে। ভদ্রলোকের ডান ভুরুর ঠিক মাঝখানে একটী বীভৎস রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন, ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে মুখের ডানদিকের অনেকটা অংশে জমাট বেঁধেছে। ভদ্রলোকের বামহাতটা চেয়ারের হাতলের পাশ দিয়ে ঝুলছে - প্রসারিত ডান হাতটা টেবিলের উপর রাখা, হাতের মুঠোয় একটা রিভলভার। মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের মাথায় কাঁচাপাকা চুল ও মুখে পাকা গোঁফ। গায়ে সবুজ সোয়েটার ও সাদা পাজামা। চোখের দৃষ্টিতে একটা আতঙ্কের ভাব। চেয়ারের পাশেই মাটিতে পড়ে একটা চামড়ার ব্যাগ। তীক্ষ্ম ও সজাগ দৃষ্টিতে

মৃতদেহ ও তার ভঙ্গীটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চঞ্চল দেখছিল। দেখতে দেখতে ভুরুটা কুঁচকে গেল। চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে সৌমেন - কি ব্যাপার দাদা? কিছু বুঝলেন? চঞ্চল মাথা নেড়ে এবার মহিমের দিকে তাকালেন - এই মৃত্যুর বিষয়টা এবার বিস্তারিত ভাবে বলুন।

মহিম - যিনি আত্মহত্যা করেছেন তাঁর নাম মানিক সামন্ত। এলাকার একজন ধনী ব্যবসায়ী। বিভিন্ন জায়গায় ওনার কাপড়ের দোকান আছে। মানিকবাবু ক্লাবের মেম্বার - পলিটিকালী ওয়েল কানেক্টেড বলে ওর মৃত্যুতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আবার রাজ্য সরকারের মন্ত্রী উনি আমায় ফোন করে অবিলম্বে রহস্যের কিনারা করতে বলেছেন। প্রাথমিক তদন্তে ব্যাপারটা সুইসাইড মনে হলেও গোলমাল আছে অন্য জায়গায়। মৃত্যুর আগে ভদ্রলোক ওর বিভিন্ন দোকান থেকে প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা সংগ্রহ করে এই ক্লাবে আসেন। ঐ ব্যাগে টাকাটা ছিল বলে দোকানের কর্মচারীরা জানিয়েছে। কিন্তু এখন টাকাটা মিসিং। এতেই সন্দেহ জেগেছে। তবে ভদ্রলোক খুন হয়েছেন এটাও স্পষ্ট নয়। চঞ্চল - মানিকবাবু কখন ক্লাবে আসেন? তখন ক্লাবে কারা কারা ছিলেন? মহিম - এখানকার সি আই টি মার্কেটের দোকান থেকে লাস্ট কালেকশানটা সেরে উনি সন্ধ্যা সাড়ে ছটার দিকে ক্লাবে আসেন। ক্লাবে তখন আরও চারজন ছিলেন। রাজু ঘোষ, তপন মল্লিক, বাবলু পাইন আর মাখন মাইতি। ওরা কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর তাস নিয়ে বসেন। আধঘন্টা মত খেলার পর আন্দাজ সাতটা পঞ্চাশে আসর ভেঙে যায়। এক এক করে ঐ চারজন নিজেদের কাজে বেরিয়ে গেলে ও মানিকবাবু ঘরেই থেকে গিয়েছিলেন। এরপর সাড়ে আটটার দিকে ক্লাবঘরের মধ্য থেকে গুলির আওয়াজ শোনা যায়। এমনিতেই শীতের রাত পার্ক অনেকটা নির্জন - তার মধ্যে কিছু মানুষ যারা হাঁটছিলেন ছুটে আসেন - এসে দেখেন এই কান্ড। ওদের মধ্যে একজন ডক্টর ছিলেন উনি শরীর পরীক্ষা করে মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেন। চঞ্চল - ঐ ডাক্তারবাবু আছেন কি? একবার ডাকুন না থাকলে? মহিম - আছেন মনে হচ্ছে। বলে তিনি ঘরের বাইরে বেড়িয়ে গেলেন। একটু পরেই একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের মাথার সব চুল সাদা, চোখে রিমলেস চশমা। মহিম - ইনি ডঃ ভবতোষ বোস। চঞ্চল - ডঃ আন্দাজ কটায় মৃত্যু হয়েছে? ডঃ বোস - সম্ভবত সাড়ে আটটার দিকে। চঞ্চল - ঠিক আছে। ডাক্তার চলে গেলে চঞ্চল বলল - আমি একটু ক্লাব ঘরের আশে পাশের জায়গা গুলো দেখেনি। যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়। ক্লাব ঘরের পাশেই খানিকটা খালি জায়গায় কিছু গাছপালা - গাছপালার পেছনেই পাঁচিল। চঞ্চল পকেট থেকে একটা পেনসিল টর্চ বার করে জায়গারটায় আলো ফেলে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে তাঁর দৃষ্টিটা কেমন সজাগ হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে পুলিশের ডাক্তার, ফটোগ্রাফার এসে তাঁদের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। কাজের ফাঁকে মহিম তাঁদের সঙ্গে কথা বলছে। পরীক্ষার পর ডাক্তার যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন চঞ্চলের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। চঞ্চল-ডক্টর মৃত্যুর সময়টা কি বুঝলেন? ডাক্তার - সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে। চঞ্চল-এটা সুইসাইড কি? ডাক্তার-তাই তো মনে হচ্ছে। ময়নাতদন্ত অবশ্য ব্যাপারটার ওপর আলোকপাত করতে পারবে। ডাক্তার চলে গেলে চঞ্চল বলল - এদিকের কাজ তো প্রায় শেষ। জিজ্ঞাসাবাদ

কিছু কি করেছেন? মহিম - হ্যাঁ, কয়েকজন পথচারী এবং ঐ চারজনকে। চঞ্চল - আমি একবার ওদের সাথে কথা বলব। মহিম - ঠিক আছে, এই ক্লাব ঘরে এক এক করে ডাকছি।

ইতিমধ্যে ডেডবডি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্লাবের মধ্যে চঞ্চল, সৌমেন ও মহিম তিনটি চেয়ারে বসেছেন। গেটে দুজন কনস্টেবল পাহারায় রয়েছে। প্রথমে ঘরে এলেন রাজু ঘোষ। বেঁটে হলেও বেশ নাদুস নুদুস চেহারার অধিকারী। গায়ের রং মিশকালো, মাথায় এক মসৃণ টাক, মুখের মধ্যে এক ধরনের নিরীহ ভাব। নমস্কার করে বসলেন। চঞ্চল - রাজুবাবু আপনি কি করেন? কোথায় থাকেন? রাজু - আমি মোবাইলের কভার, চার্জার এসবের একটা দোকান চালাই। এই সি আই টি মার্কেটেই কাছেই পেয়ারী মোহন রোডে থাকি। চঞ্চল - মানিকবাবুর সাথে আপনার কি রকম পরিচয় ছিল? রাজু - আমরা দুজনে এই ক্লাবের অনেকদিনের মেম্বার। যদিও মানিকদা অন্য এলাকায় থাকতো কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব ছিল গভীর। চঞ্চল - আজ কখন ক্লাবে আসেন? কখন যান? তখনও কি মানিকবাবু জীবিত ছিলেন? ক্লাব থেকে কোথায় যান? রাজু - ছটায় আসি। তাসের আড্ডার পর আটটায় বেরিয়ে যাই। তখনও মানিকদা বেঁচে। এখান থেকে আমি টালিগঞ্জে নবীনা সিনেমার কাছে গিয়েছিলাম ব্যবসার কাজে। চঞ্চল- মানিকবাবুর পারিবারিক জীবন কেমন ছিল? রাজু - মানিকদা বেশ দিলদরিয়া লোক ছিল। যদিও ইদানীং কালে একটু চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন আগে বৌদি মারা যায়। একমাত্র ছেলাটাও বখাটে হয়ে গিয়েছিল। চঞ্চল- ছেলের সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল? রাজু -একদম বনিবনা হত না। চঞ্চল - বেশ, এই কাগজটায় একটা সই করুন আর বাইরে গিয়ে বাবলু পাইনকে পাঠিয়ে দিন। বাবলু পাইন লম্বা, রোগাটে, রুক্ষ চেহারা, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, টিকালো নাক, বড় বড় চোখ, যদিও চোখের কোণে কালির ছোপ, মাথার লম্বা লম্বা চুল গুলো এলোমেলো। আচার আচরণে একটা উদ্ধতভাব। চঞ্চল- বসুন বাবলুবাবু। বাবলু - না বসব না। যা জিজ্ঞাসা করার তাড়াতাড়ি করুন। আমার কাজ আছে। চঞ্চল- কি করা হয়? বাবলু - আমি শঙ্কর বোস রোডে একটা অ্যাপ্টারমেন্টে কেয়ারটেকারের কাজ করি। চঞ্চল- মানিকবাবুর সঙ্গে কতটা পরিচয় ছিল? বাবলু- আমরা একটা পাড়ায় থাকতাম। যদিও ও ছিল বড় মানুষ আমি গরীব। চঞ্চল - তাও একসঙ্গে তাস খেলতেন? গভীর বিরক্তিতে বাবলুর মুখটা বেঁকে গেল - কোন জবাব দিল না। চঞ্চল - কখন ক্লাবে আসেন? কখন যান? তখন কি মানিক বেঁচে ছিলেন? ক্লাব ছেড়ে কোথায় যান? বাবলু - আমি আর মাখন এক সঙ্গে সাড়ে ছটা নাগাদ ক্লাবে আসি। আবার একসঙ্গে সাতটা পঞ্চাশেই বেরিয়ে যাই। ওখান থেকে দুজনে বাড়ি চলে যাই। তারপর মাখনের কাছে খবর পেয়ে আবার পার্কে আসি। হ্যাঁ যখন আমরা ক্লাব থেকে চলে যাই মানিক বেঁচে ছিলেন। এরপর মাখন মাইতির আগমন -শীর্ণ লম্বাটে দেহের মাখনের মুখে বসন্তের দাগ, প্রশস্ত কপালের নীচে রোমশ ভুরু, ভুরুর নীচে কোটরগত চক্ষু দুটি, মাথার চুল কদমছাট। মাখনের বয়ান বাবলুর মতই হওয়ায় তার কাছ থেকে নতুন কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সর্বশেষে এল তপন মল্লিক চেহারা শুকনো পাকানো দড়ির মত ও মুখের গড়নটা শৃগালের মত। মুখে মোটা গোঁফ ও খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ মুখে একটা ধূর্তভাব। চঞ্চল -আপনি কি করেন? তপন - আমি একটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান চালাই - লোকের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটির কাজ করি। চঞ্চল - কখন ক্লাবে আসেন? কখন যান? ক্লাব থেকে কোথায় যান? তপন - ছটা কুড়ি নাগাদ এসেছি। আবার আটটা পাঁচে চলে যাই। তখনও মানিকবাবু জীবিত ছিলেন। ওখান থেকে ধানকলের মাঠে দেবেশ ঘোষালের বাড়ি গিয়ে ইলেকট্রিকের কাজ করছিলাম। খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। তারপর খবর পেয়ে এখানে আসি। চঞ্চল - মানিকবাবুর সাথে কেমন সম্পর্ক ছিল? তপন - ওনার বাড়িতে ইলেকট্রিকের কাজ গুলো আমিই করতাম। অনেক দিনের যোগাযোগ। ওনার আত্মহত্যাটার ব্যাপারটা মানতে পারছি না। চঞ্চল -আত্মহত্যা করেছেন বলছেন। কেন করলেন বলুন তো? তপন - পারিবারিক অশান্তির জন্যই মনে হয়। চঞ্চল - বেশ, এই কাগজটায় সই করে এটা নিয়ে গিয়ে বাবলু আর মাখনকে দিয়ে সই করিয়ে এখানে দিয়ে যান। তপন বেরিয়ে যেতেই চঞ্চল তার পিছু নিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়ে কি একটা দেখে এল। ফিরে এসে বলল - মহিম বুঝলেন এখানকার কাজ আপাতত শেষ। তবে আপনাকে আরও কয়েকটা কাজ করতে হবে। মহিম - বলুন। চঞ্চল - এই চারজনের অতীতের কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে নাকি খোঁজ নিন। এদের মোবাইলের টাওয়ারের লোকেশান সম্পর্কে খোঁজ করে গতিবিধির খবর নিন। বিশেষত আটটা থেকে সাড়ে আটটায় এরা কোথায় ছিল সেটা জানা দরকার। সৌমেন এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার বলল - কেন এত কিছু জানতে চাইছেন? চঞ্চল - দুদিনের মধ্যে জানতে পারবে।

পরদিনই মহিম ফোন করে চঞ্চলকে প্রয়োজনীয় তথ্য গুলো দিয়ে দিল। সব শুনে চঞ্চলের মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। তারপর বলল - শুনুন আপনাকে আরও কয়েকটা কাজ করতে হবে। কাজ সেরে বিকেলের দিকে আমার বাড়িতে একবার আসুন। সেদিন বিকেল বেলায় সৌমেন এসে দেখল চঞ্চল তার প্রিয় আরাম কেদারায় বসে একটা বই পড়ছে। সামনের সোফাটায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে সৌমেন বলল- তারপর দাদা রহস্যের কিছু কিনারা হল? চঞ্চল বই থেকে মুখ না তুলে বলল - কিনারা হয়ে গেছে। হত্যাকারী প্রমাণসহ গ্রেপ্তার হয়েছে। মহিম এল বলে। বলতে বলতে কলিং বেলটা বেজে উঠল। দরজা খুলতেই সাদা পোশাকে মহিমের প্রবেশ হাতে মিষ্টির প্যাকেট। চঞ্চল - বসুন। তারপর খবর কি? মহিম - দাদা হত্যাকারী ও তার সহকারী তাদের দোষ স্বীকার করেছে। সৌমেন (হতবাক হয়ে) - আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনা। শুনলাম সুইসাইড আবার আপনারা বলছেন হোমিসাইড। চঞ্চল - সব বলছি। মন দিয়ে শোন।

চঞ্চল - অকুস্থলে গিয়ে মৃতদেহের ভঙ্গীটা দেখেই আমার সন্দেহ হয় যে মৃত্যুটাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর একটা চেষ্টা হয়েছে। কেন না আত্মহত্যা হলে ক্লোজরেঞ্জে গুলি ছোঁড়ার ফলে ক্ষতের চারপাশে কার্বনের দাগ থাকত আর আশপাশের চুল ও ঝলসে যেত। কিন্তু পরীক্ষা করে তেমন কিছু দেখলাম না। তাছাড়া কাছাকাছি গুলি চালালে গুলিটা খুলি ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কিছু হয়নি। এর থেকে আমি নিশ্চিত হলাম এটা হত্যা। মৃতদেহ দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলেন। কাজেই খুনী তার সামনে দাড়িয়ে তাকে গুলি করে মারে। ক্ষতচিহ্নের অবস্থান দেখেই আমার সন্দেহ হয় যে খুনী লেফট হ্যান্ডেড বা বামহাতে বন্দুক চালায়। তাই সন্দেহ ভাজন চারজনকে দিয়ে সই করাতে দিয়ে পরীক্ষা করলাম। দেখলাম একজনই বাম হাতে সই করল।

কিন্তু সে সবার শেষে মানিক সামন্তকে ছেড়ে যায়নি। তারপর তপন মল্লিক গেছে। তদন্ত করে বুঝলাম যে সাতটা পঞ্চাশে বাবলু আর মাখন বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই হয়ত সাতটা পঞ্চান্ন নাগাদ রাজু মানিকবাবুকে গুলি করে। তপনের সামনেই গোটা ব্যাপারটা হয়। আসলে দুজনের পরিকল্পনা মাফিক কাজটা হয়। এরপর রাজু বেরিয়ে যায় তারপর তপন। সৌমেন - গুলির আওয়াজ কেন শোনা যায়নি? চঞ্চল - আসলে রাজু রিভলভারের মুখে সাইলেন্সার লাগিয়ে রেখেছিল। যাই হোক সাড়ে আটটার দিকে রাজু আবার ক্লাব ঘরের পাশে এসে একবার রিভলভার চালায়। এই ফায়ারিং এর আওয়াজে পার্কের লোকজন ছুটে আসে। তার আগেই রাজু ছুটে পালায়। এইভাবে সে সকলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যে মৃত্যু সাড়ে আটটায় হয়েছে। আগেই ও আর তপন মিলে মৃত্যুটাকে আত্মহত্যার চেহারা দিতে চায়। কিন্তু এই চালাকিটা আমি ধরে ফেলি। তারপর ক্লাব ঘরের পাশে অনুসন্ধান চালিয়ে একটা গন্ধরাজ গাছের ডালে আমার চোখ পড়ে। সেই ডালে একটা ছোট ধাতুর মত জিনিস বিঁধে ছিল। ওটাকে উদ্ধার করে বুঝতে পারি যে ওটা খরচ হওয়া একটা কার্তুজ। তখনই সব ব্যাপারটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপর মহিম বাবুকে দিয়ে কয়েকটি বিষয়ে খোঁজ নিলাম। তাতে জানতে পারলাম ওরা চারজনেই অতীতে সমাজ বিরোধী ছিল। বিশেষত রাজু পাইপগান, রিভলভার চালানোয় পাকা হাত, ও জেলও খেটেছে। সৌমেন -আদর্শ মহাপুরুষ। কিন্তু ওদের মোটিভ কি ছিল? চঞ্চল - অবশ্যই টাকাটা নেওয়া। যেহেতু রাজু ও তপনের মানিকবাবুর বাড়িতে যাতায়াত ছিল ওরা ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। টাকার লোভেই কাজটা করে। সৌমেন - কি করে নিশ্চিত হলে রাজু টালিগঞ্জে যায়নি, বরং চেতলাতেই ছিল। চঞ্চল - আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে। ঐ সময়ে রাজুর মোবাইলের টাওয়ারের লোকেশানই ওকে ধরিয়ে দেয়। তবে মহিম ও যথেষ্ট খেটেছে। ও তল্লাসী চালিয়ে রাজুর বাড়ি থেকে রিভলভার, সাইলেন্সার এমনকি চুরি যাওয়া নোটের বান্ডিলটাও উদ্ধার করেছে। মহিম - যাই বলুন দাদা, আপনার সাহায্য ছাড়া এই জটিল রহস্যের সমাধান সম্ভব ছিল না। সৌমেন - আর আমার ক্রেডিট নেই? আমিই তো দাদাকে জোর করে ঘটনাস্থলে নিয়ে গেলাম। না হলে এখনও রহস্যের গোলক ধাঁধায় পথ খুঁজে বেরাতিস। মহিম - তার প্রাইজ এখনই তোকে দিচ্ছি - বলে মিষ্টির প্যাকেট করে একটা বিরাট সন্দেশ বার করে সৌমেনের মুখে ঢুকিয়ে দিল। দুই বন্ধুর কান্ড কারখানায় অট্টহাস্য করে উঠল চঞ্চল চক্রবর্তী।।

দেওয়ালের কান

মহিবার রহমান
কম্পিউটার পারসোনাল
(ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়)

দেখি　কথার মাঝে হারিয়ে লয়
　　চোখে-মুখে তার ভয়-ভয়।
সে　এদিক-ওদিক তাকিয়ে শেষে,
　　বলতে এলো কানের কাছে।
আবার　ফিস-ফিসিয়ে কইছে পাছে,
　　"দেওয়ালের ও নাকি কান আছে!"
তবে　কান আছে কি তা জানিনা,
　　অমন কানের ধার ধারিনা।
এমন　কান যদিবা থেকেই থাকে,
　　ঘরের পাশে, গলির বাঁকে।
জানি　নেই সত্যিতে তার মাথা-ব্যথ্যা,
　　বানোয়াটেই তার আড়ি পাতা।
যদি　দেওয়াল থেকে 'কান'টা ছিঁড়ে,
　　বসাতে পারো বিবেক-শিরে।
দেখবে　কানের প্রতি ভয়টাই মিছে,
　　সব সমাধান এক নিমেষে।

“অবুঝ”

ইব্রাহিম মোল্যা
দ্বিতীয় বর্ষ, (ইংরেজি অনার্স), রোল- ১০৭

বলতে তো পারি সবাই, কিন্তু
বুঝতে কেন পারিনা সবাই?
পাখি ডাকছে গাছে আপন মনে - কুহু কুহু,
জানিনা কি বলতে চাইছে সে, বুঝতেও পারি না
সুন্দর মনহারা পাহাড়, আছে
‘দেশ’ নামক ঘরের দেওয়াল হয়ে,
বুঝিনা কি তার দুঃখ, ব্যথা, বেদনা।
অপূর্ব অপূর্ব ‘বৃক্ষ’ আছে এ জগতে,
দেখলে মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়,
তবুও চোখ বন্ধ করে ধ্বংস করে আসছি।
বুঝতে পারিনা কেন তারা এই জগতে?
মেঘ ভরা আকাশ, পৃথিবীর ও ছাদ,
তাকিয়ে দেখেছি হাজারো বার।
সাদা কালো মেঘে ভরা আকাশ
হাসছে খিলখিল করে
তবুও বুঝতে পারিনা কি বলতে চায় সে।
নদীর বালুচরে বসে থাকি যখন
নদীর ঢেউ এসে পায়ে লাগে
সারা দেহ চনমনে হয়ে যায়, ঢেউ চলে যায়,
তবুও বুঝিনা কী বলে গেল সে,
ব্যস্ততার এই যুগে পার হয়ে যায় সময়
“প্রতিযোগিতার পিছনে”।
বুঝতে পারিনা কিছু, বোঝার আগে!!

বর্ষার স্বাদ

মোঃ মোয়াল্লেম মোল্যা
বি.এ. (অনার্স), আরবী

পূবের কোণে মেঘ জমেছে
শ্রাবণ ধারায় ঝরে
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারা
ঝিরঝিরিয়ে পড়ে।

তুলসীর গন্ধে ভরা যেন
জলরাশির ছল
কোত্থেকে যে উড়ে এলো
হাজার ফোটার জল।

বর্ষা বর্ষা নামলো বর্ষা
বঙ্গ বুকের দ্বারে
বাংলার মাঠ, ফুল, জল, ক্ষেত
বৃষ্টির জলে পুরে

সার্সি, কচুপাতা মাথায় বেঁধে
চাষীরা চলল মাঠে
এক গাঁটে বাঁধা দেশলাই কাঠি
তামাক হুঁকা আর গাঁটে।

চাষীর মুখে বাংলার গান
হাটে, মাঠে, কাটে বেলা
বারে বারে চাষীর হুঁকার টান
দেয় যে বুকে জ্বালা।।

সংশয়

আসরাফুল খান

তৃতীয় বর্ষ, ইংরাজী (অনার্স), রোল- ২৮

কবিতা তো এর আগে অনেক লিখেছি, আর পোস্ট করেছি ফেসবুকে
আজকে না হয় আর একটা লিখব, ঝামেলা তো যাবে চুকে।
কিন্তু আজ কবিতা লিখতে, কেবল কলম যাচ্ছে থেমে
প্রবল আবেগের পারদ চড়েও, এক নিমেষেই যাচ্ছে তা নেমে
কবিতা লিখলাম, জমা দিলাম কিন্তু ম্যাগাজিনে হবে তো ছাপা
নাকি হাজার কবিতার ভিড়ে, আমারটা পড়ে যাবে চাপা।
এমনি করে সারাদিনে, কত প্রশ্ন দিল যে মনে উঁকি
শেষমেশ তাই কবিতা লেখার, নিলাম না আর ঝুঁকি।।

মেয়েদের ব্যথা

মাবিয়া পারভিন

দ্বিতীয় বর্ষ, রোল- ১৩৬

দেখতে দেখতে হলাম বড়ো
এবার হবে বিয়ে
কোথা থেকে কে এসে
যাবে আমার নিয়ে।
মা-বাবা, ভাই-বোন
নিমেষে হবে পর
সকল কিছু ভুলে গিয়ে
করব স্বামীর ঘর
বিদ্রোহী মন বলে ওঠে
বিয়েটাই কি সব?
জগৎ আমার পাল্টে যাবে
করতে পারবো না রব।

মরীচিকা

মাবিয়া পারভিন

দ্বিতীয় বর্ষ, রোল- ১৩৬

উফ, আর পারছি না!
খালি হেঁটে যাই আর হেঁটে যাই,
তবু কিছুতেই, তার নাগাল না পাই।
কোন সে দূরে, দেখেছি তারে,
কাছে গেলেই যাচ্ছে সরে সরে।
হায়রে, কি ভীষণ জলকষ্ট,
বেঘোরে প্রাণটা হল বুঝি নষ্ট।
ধুর!
আলো নাকি ছাই, কিসের কারণে,
পড়েছিনু বটে, মন তবু যে নাহি মানে।
তাই চোখে দেখে মনে জাগে আশা,
একটু গেলেই বুঝি মিটবে পিপাসা।
শান্ত জলে ক্ষান্ত হবে এ তেষ্টা।
একবার করেই দেখি না শেষ চেষ্টা।
আহা রে!
ক্লান্ত পায়ে চলেছি, মনে নিয়ে ভয়,
গরম বালুতে হাঁটা সোজা কথা নয়।
কিন্তু কোথা গেল জলে গাছের ছায়া?
যা দেখেছি সবই কি প্রকৃতির মায়া?
হায় রে অভাগা ! এতক্ষণ ছুটলি মিছে,
রোদে পোড়া মরুতে মরীচিকার পিছে।

শেষ দিন

আসমা খাতুন

দ্বিতীয় বর্ষ, রোল- ২১৮

কেউবা হাসে, কেউবা কাঁদে,
কেউবা থাকে সুখে।
আর কেউবা থাকে হাসি মুখে,
দুঃখ নিয়ে বুকে।
কেউবা দেখায় টাকার গরম
কারো বা রূপের দেমাক,
কেউবা করে বাণিজ্য, চাকরি,
কেউবা করে চাষ।
কারো বা আসে সুখী জীবন,
কারো দুঃখে বাস,
চলছে জীবন এই ভাবে
যাচ্ছে সময় বয়ে।
আসছে সময় সেই দিন
ভাবছি বসে মনে,
ফুরিয়ে যাবে রাত তখন
ফুরাবে এসে দিন,
শেষ হবে এই সূর্য দেখা,
শেষ হবে দেখা এই চাঁদ।
হাজারও বন্ধু ছেড়ে
যেতে সবার হবে।
আপন মনে আমি
লিখলাম-এ কবিতা,
ভুল যদি করে থাকি
ক্ষমা করো বিধাতা।

শেষ চিঠি

আসমা খাতুন

দ্বিতীয় বর্ষ, রোল- ২১৮

এই মনে স্বপ্ন ছিল
ছিল অনেক আশা,
আর ছিল তোর জন্য,
গভীর ভালোবাসা।
ছিন্ন করে গেলি তুই
দিয়ে মনে ব্যথা।
আজ আমার এই মন
আছে শুধু ফাঁকা,
ভালোবাসার নামে তুই করলি শুধু খেলা,
হাতটি ছেড়ে চলে গেলি,
আমায় করে একা।
বলেছিলিস সাথে থাকবি সাত জনম ধরে,
এক জনম ফুরালো না চলে গেলি ছেড়ে।
তবুও বলি ভালো থাকিস,
থাকিস অনেক সুখে
আসবো না আর কোনোদিন
আমি যতই থাকি দুখে?

অচিনপুরে

মিকাইল মোল্যা (আরিফ আমান)

বি.এ (ইংরাজী), অনার্স

''মিসাইল ম্যান, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আকাশের নক্ষত্র যিনি আজ
আকাশের গায়ে থেকে ঝরে গেছে,
তাঁকে জানাই কৃতজ্ঞতা
যিনি আমাদের দেশের গর্ব
তাঁর উদ্দেশ্যেও উৎসর্গে কিছু কথা''
আশার সে প্রজ্বল নক্ষত্র ঢাকিছে ক্লান্তির মেঘে
চারিদিকে সারা আকাশ ক্লান্ত ডেকে ডেকে
কাল সারারাত সারাদিন কিরণ দিয়েছ এঁকে বেঁকে
আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে মনে ফুটলে তুমি কোন গগনে
গিয়েছ তুমি হারিয়ে আজ সবার মনের বনে।
বিশ্বের শিরায় শিরায় রক্তের স্রোত বয়
তোমারি আত্মাহুতি করলো বিশ্বজয়।
দেশবাসীর নয়ন ধার করলে জলে ভরপুর
আজ বা তবে কেন গেলে মনের অচিনপুর।
তোমারি চরণে ধন্য ভূমি ধন্য হয়েছে শীর্ষ
সাত রাজার ধন এক মানিক বুকজোড়া ''ভারতবর্ষ''।
ডুবিছে সূর্য ঢাকিছে তারা মেঘের আনাগোনায়
নক্ষত্র আজ আড়ালে থেকে সবার ''সালাম'' জানায়।
তিনি ভারতবাসীর মুক্তিতে জয়গানটি গাইল
তাঁর প্রতি এ বিশ্ববাসীর সবার ''স্যালুট'' রইল।
যেখানে আছে সুখে থাকুক সারাজীবন ভরি
ভারতবাসী সবাই তার মুক্তি কামনা করি।।

হে প্রভু বুঝ দাও

সাবির হোসেন

দ্বিতীয় বর্ষ, রোল-৫২৪

জ্যোৎস্না রাতে তাকিয়ে দেখি আকাশে
মিট মিট করে নক্ষত্রগুলি।
হঠাৎ চমকে দেখি খিল-খিলিয়ে হাসিছে শশী,
জীবনে এমন দৃশ্য বড় প্রয়োজন,
পুরানো স্মৃতি শূন্য, শূন্য হয় মন।
ব্যর্থতা হতাশা আর নিরাশা
এটা কি জীবনের কারো আশা?
সুখ চায় সকলে নিঃসন্দেহে
অর্থ কি আনতে পারে প্রকৃত সুখ?
ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা এটা কি প্রকৃত স্বপ্ন?
প্রশ্নরা বাসা বাঁধে জেগে স্বপ্ন আছে যেখানে,
এ অদ্ভুত পৃথিবীর মহিমা বোঝা বড় কঠিন
হে প্রভু আমার বুঝ দাও।
একই জাতিতে ভিন্ন জাতি রয়,
একই জাতিতে ভিন্ন রূপে ভিন্ন ঢং।
হে প্রভু এ পৃথিবীতে এক কণা মায়া দিলে।
মায়ার জালে জড়িয়ে তোমার
গুনগান থেকে দূরে রয়।
হে প্রভু আমাদের বুঝ দাও।

বাবা

বিপুল রহমান

তৃতীয় বর্ষ, রোল-৮২

ভোলা কি যায় তোমায়?
যতদিন জেগে রব ততদিন তুমি থাকবে
জ্বালিয়ে রেখেছি তোমার আদেশ নিষেধকে
সমাজ আজ অনেক পাল্টে গেছে
ছোটবেলার পাশবালিশটার
আজ আর নেই কোনো জ্যোতি,
পারিনা ভুলতে তোমার শাসন সোহাগের স্মৃতি।
বিনিদ্র রাতে তোমাকেই মনে পড়ে
তুমি আমার এ জীবনের আর্শীবাদ
হঠাৎ ভোরে জেগে উঠি
মনে পড়ে যায় ঈশ্বর-সাধনার স্মৃতি।
বাবা, ক্ষমা করো আমায়
দুর্ভাগ্য বদলে দিয়েছে আমায়
তবুও বিনিদ্র রাত, নিমগ্ন ভোরে
থাকো তুমি আমার হৃদয়ে।
প্রার্থনা করি পরম ঈশ্বরের তরে
বাবা, ভালো থেকো তুমি...।

স্বপ্ন সলিলের তীরে

মোঃ বিপুল রহমান
তৃতীয় বর্ষ, রোল-৮২

ফুল ঝরে যায়, হঠাৎ
গাছ মনে রাখে না,
        ঝরে যাওয়া ফুলকে
সে চায় নতুন ফুল
        ফুল হয়েও তুমি
                ঝরে গিয়েছো বহুকাল আগে
আমার স্বপ্ন সলিলের তীরে
তবু বেঁচে আছো
        হৃদয়ে আমার
ঝরে যাওয়া ফুল তুমি
        তবু তোমার গন্ধে বিভোর আমি
হয়তো একদিন ঝরে যাবো
        তোমার ন্যায়
        আমার স্বপ্ন সলিলের তীরে।

নীরব অনুভূতি

অনামিকা মন্ডল
বি.এ (অনার্স) ইংরাজী

মনের অনুভূতিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা
কখনও সখনও ব্যর্থ হয়।
চিত্রকর নই, নই দারুন কবি
তবে মনে মনে আঁকি অনেক ছবি
সে ছবিতে অনেকটা বাস্তবতা
সে ছবিতে আছে একটি মেয়ের নীরবতা।
না চাওয়াতে জন্ম হয়েছে যার
তার মনেও বেজেছিল একদিন প্রেমের সেতার
সেই সাগরে ডুব দিয়েছে মন।

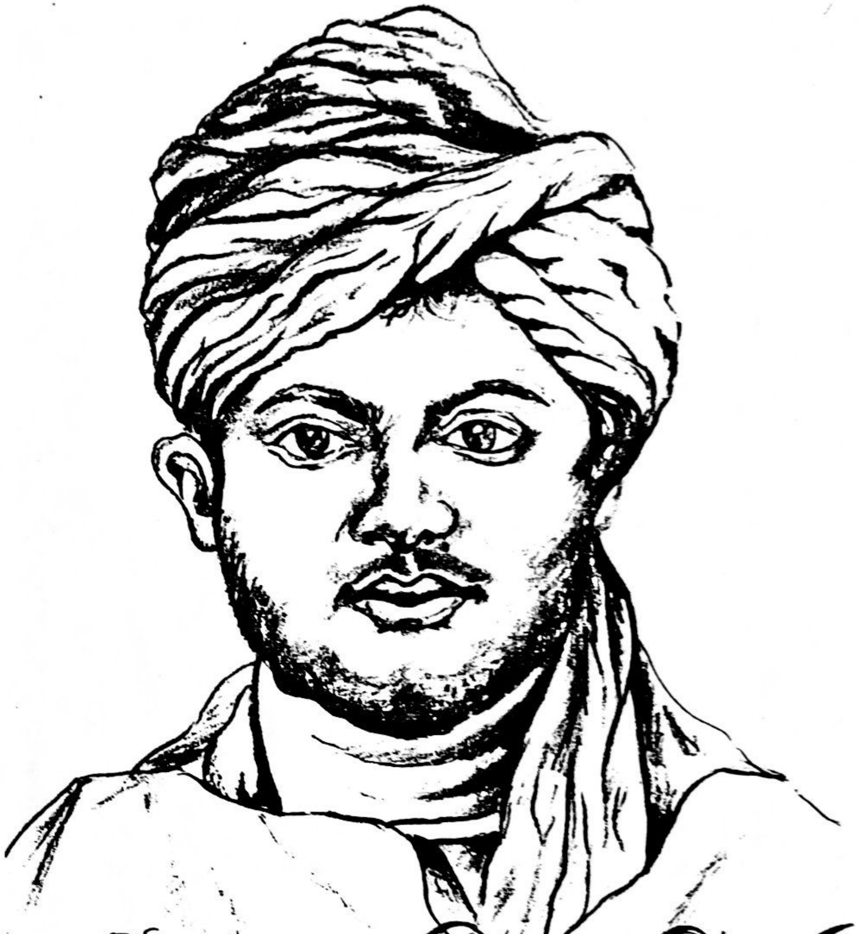

তুমিই তোমার ভবিষ্যতের সৃষ্টি কর্তা

সকাল চৌধুরী
দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা (অনার্স)
রোল নং - ১৮৫

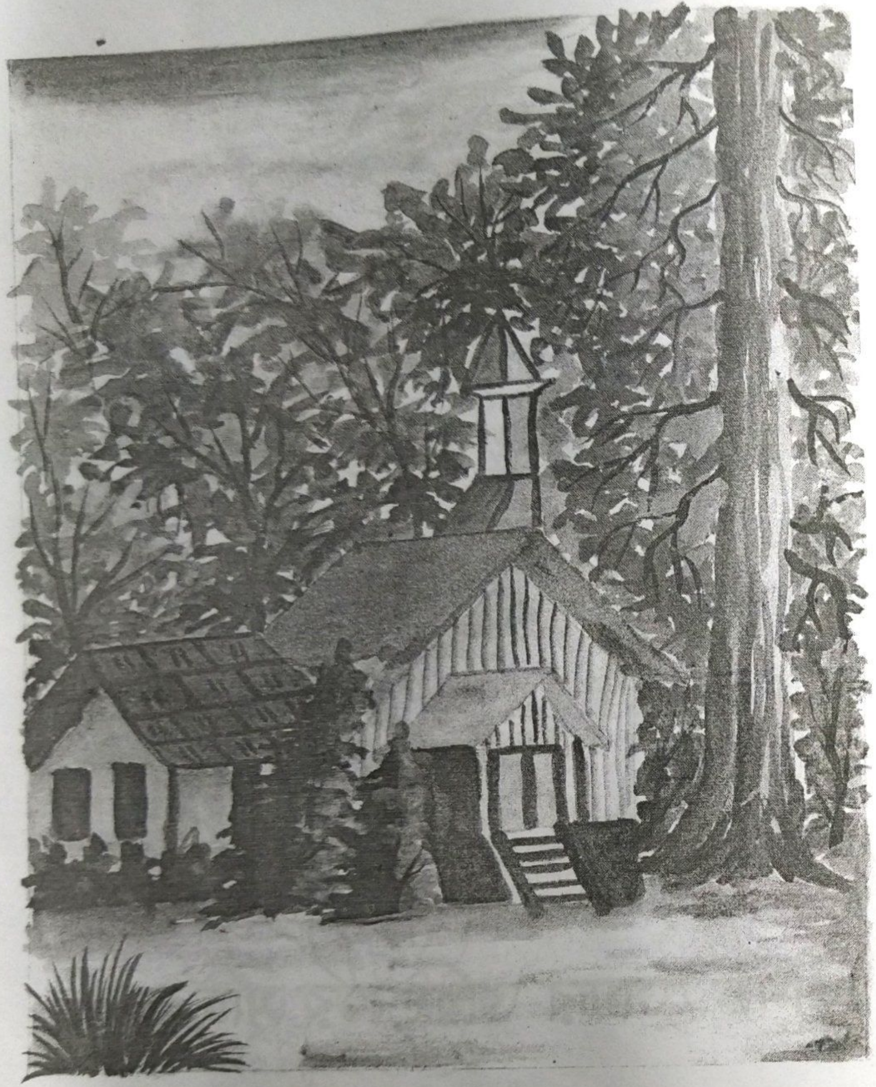

ঝুমা মাহালী
প্রথম বর্ষ, বাংলা (অনার্স)
রোল নং - ৬৪

BHANGAR MAHAVIDYALAYA

বাংলা বিভাগ বিশেষ বর্ক্তৃতা বক্তা বসুধা বিশ্বাস

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ ইতিহাস বিভাগ

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ বাংলা বিভাগ

জাতীয় সেবা প্রকল্প

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ও বাংলা বিভাগ

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ ইংরাজী বিভাগ